৭ জুলাই ২০১৬, ২৩ আষাঢ় ১৪২৩, ৩ শাওয়াল ১৪৩৭, বর্ষ ২ বৃহস্পতিবার সংখ্যা ৩৯, পৃষ্ঠা ১৬, দাম ২ কাতারি রিয়াল, ৩০০ বাহরাইনি ফিলস

ঈদ-উত্তর সংখ্যা

بروتوم آلو النسخة الخليجية الأسبوعية

সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ

প্রথম আলো

The Most Popular Bangladeshi Newspaper **Prothom Alo Weekly Gulf Edition** Printed & Distributed by Dar Al Sharq, Qatar

শাকিব খানকে জিতের শুভেচ্ছা
পৃষ্ঠা : ১৫

জাল ক্রেডিট কার্ডে দেড় লাখ দিনারের কেনাকাটা
পৃষ্ঠা : ৭

কারাতে কন্যা অনিতার কথা
পৃষ্ঠা : ১৩

www.prothom-alo.com Thursday, 7 July 2016, 23 Ashar 1423, 3 Shawal 1437, Year 2, Issue 39, Page 16, Price - Qatar: QR. 2, Bahrain: 300 Fils /DailyProthomAlo /ProthomAlo

গুলশান হামলা

শোকাহত বাংলাদেশ

স্তব্ধ শোকার্ত বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

১ জুলাই সন্ধ্যারাত। গুলশান লেকপাড়ের অভিজাত হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরাঁ। দেশি-বিদেশি অতিথিদের সৌম্য উপস্থিতি। ফটকে হঠাৎ গুলির শব্দ। তলোয়ার-আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ঢুকে পড়ল সাত জঙ্গি। তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে পুলিশ-র‍্যাব। জঙ্গিদের অতর্কিত বোমা হামলা। শুরুতেই নিহত পুলিশের দুই কর্মকর্তা। দেশে-বিদেশে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। রাতভর জিম্মি উদ্ধারের প্রস্তুতি। সকালে যৌথ বাহিনীর কমান্ডো অভিযান। পাঁচ জঙ্গির মৃত্যু। নিয়ন্ত্রণে পুরো রেস্তোরাঁ। কিন্তু এরপরের দৃশ্য ভয়ংকর। একে একে মিলল ২০ জিম্মির লাশ। হতভম্ব অপেক্ষারত স্বজন। স্তম্ভিত বাংলাদেশ।

সরকারি ভাষ্যমতে, রাজধানী ঢাকার গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারি নামের রেস্তোরাঁয় জঙ্গিরা ১ জুলাই রাতের বিভিন্ন সময় তিন বাংলাদেশিসহ ২০ জন জিম্মিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৭ জন বিদেশি নাগরিক। এর মধ্যে জাপানের সাতজন ও ইতালির নয়জন রয়েছেন। বাকি একজন ভারতীয় নাগরিক। যৌথ বাহিনীর কমান্ডো অভিযানে একজন জাপানি, দুজন শ্রীলঙ্কানসহ ১৩ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

অভিযান শেষ হওয়ার পর আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে অভিযানে নিহত সন্দেহভাজন হামলাকারীদের পরিচয়। ইতিমধ্যে চারজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। একজন বাদে বাকিরা স্বচ্ছল ও প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য। উদার পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন তাঁরা। চারজনের দুজন দীর্ঘ সময় নিখোঁজ ছিলেন। তাঁদের পরিবার থানায় জিডিও করেছিল। নিহত একজনের পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এই পাঁচজনের ছবি প্রকাশ করে আইএস দাবি করেছে, এঁরাই হামলা ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছেন।

২ জুলাই ভোরে জিম্মি উদ্ধারে

- পাঁচ জঙ্গি ও ২০ জিম্মি নিহত
- পরিচয় পাওয়া চারজনের তিনজনই প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান
- দেশের মানুষ হতবাক, স্তম্ভিত, দুই দিনের শোক পালন

সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পরিচালিত যৌথ অভিযানে নিহত হন ছয়জন। এঁদের সবাইকে 'সন্ত্রাসী' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল সেনাসদরের ব্রিফিংয়ে। অভিযানের সময় একজনকে আটক করার কথা বলা হলেও ৪ জুলাই পর্যন্ত তাঁর পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

তবে ঢাকা মহানগর পুলিশ ৩ জুলাই বলেছে, এই ছয়জনের একজন ওই রেস্তোরাঁর রান্নাঘরের কর্মী ছিলেন। তাঁর নাম সাইফুল ইসলাম। তাঁর পরিবার বলছে, তিনি ঘটনার শিকার। সন্ত্রাসী হামলার পর সাইফুল তাঁর ভগ্নিপতিকে ফোন করে বলেছিলেন যে তাঁরা বন্দুকের মুখে জিম্মি অবস্থায় আছেন।

পরিচয় পাওয়া চারজন হলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রোহান ইবনে ইমতিয়াজ, স্কলাসটিকা থেকে ও লেভেল পাস করা মীর সামেহ মোবাশ্বের, মালয়েশিয়ার মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিবরাস ইসলাম ও বগুড়ার একটি মাদ্রাসার ছাত্র খায়রুল ইসলাম ওরফে পায়েল। নিবরাস আগে ঢাকার টার্কিশ হোপ স্কুল ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন।

পুলিশ বলছে, বগুড়ার খায়রুলই গুলশানে হামলার নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি এর আগে উত্তরবঙ্গে অন্তত তিনটি হত্যায় জড়িত ছিলেন।

অভিযানে নিহত রোহান ইবনে ইমতিয়াজের বাবা ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের নেতা।

আওয়ামী লীগের একজন নেতার ছেলেও হামলায় জড়িত থাকা প্রসঙ্গে সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলেন, 'এদের সবারই বাংলাদেশে একটা অবস্থান রয়েছে। সবারই বাংলাদেশে বাবা-মা আছে, তাঁরা (বাবা-মা) জঙ্গি না, এটা নিশ্চিত। এদেরকে বাবা-মা হয়তো খোঁজাখুঁজি করেছিলেন। তারা যে জঙ্গি সংগঠনে জড়িত হয়েছে, তাদের বাবা-মা জানতেন না, এখন জানলেন।'

সন্দেহভাজন যে হামলাকারীর পরিচয় ৪ জুলাই পর্যন্ত জানা যায়নি তাঁর সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও টুইটারে বিভিন্ন তথ্য দেখা গেছে। ওই সব তথ্য যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, এখন তাঁরা মনে করছেন, আইএসের কথিত বার্তা সংস্থা 'আমাক নিউজের' বরাত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাইট ইন্টেলিজেন্স যে পাঁচজনের ছবি দিয়েছে, তাঁরাই মূলত হামলায় অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরা সবাই অভিযানে নিহত হন।

রোহান : অভিযানে নিহত রোহান ইবনে ইমতিয়াজের বাবা এস এম ইমতিয়াজ খান ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের নেতা, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উপমহাসচিব ও সাইক্লিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক। রোহানের মা শিক্ষিকা। দুই ভাইবোনের মধ্যে রোহান বড়। তিনি ঢাকার স্কলাসটিকা থেকে এ লেভেল শেষ করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন।

৩ জুলাই দুপুরে রোহানদের ঢাকার লালমাটিয়ার বাসায় গিয়ে তাঁর বাবা-মাকে পাওয়া যায়নি।

এরপর পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

গুলশানে জঙ্গি হামলায় নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ ৪ জুলাই হস্তান্তর করা হয়। এ সময় নিহত স্বজনের কফিন দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন এই নারী ● প্রথম আলো

ঢাকায় সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা কাতারের

প্রথম আলো ডেস্ক

রাজধানী ঢাকার গুলশান এলাকায় হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরাঁয় সন্ত্রাসীদের হামলা ও জিম্মিদের হত্যার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে কাতার। ওই ঘটনায় ১৭ জন বিদেশিসহ ২০ জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া কমান্ডো অভিযানে নিহত হয়েছে পাঁচজন সন্ত্রাসী।

কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ৩ জুলাই প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সন্ত্রাসী ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলা হয়েছে, এই সন্ত্রাসী হামলা মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের চরম লঙ্ঘন। বিবৃতিতে কাতার সব ধরনের সহিংসতা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাদের কঠোর ও দৃঢ় অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে।

১ জুলাই সন্ধ্যার পরপরই তলোয়ার-আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ে সাত জঙ্গি। রেস্তোরাঁর কর্মী ও অতিথিদের জিম্মি করে তারা।

এরপর পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

সিনেমা ও বাস্তবে অবিশ্বাস্য মিল!

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়াদিল্লি

দৃশ্যটা এই রকম: মা, বাবা, চাচি ও ছোট বোনের সঙ্গে গলির মোড়ে সরকারি গাড়ি থেকে ছোট্ট সনু গত ৩০ জুন শেষ বিকেলে যখন নামল, দিগ্‌বিদিক কাঁপিয়ে এমন একটা চিৎকার উঠল যেন এইমাত্র মুস্তাফিজুর রহমানের বলে প্রতিপক্ষের তেকাঠি ছিটকে গেল! মুহূর্তের মধ্যে মিডিয়ায় হুটোপুটি। মা-বাবার কাছ থেকে আরও একবার ছিনতাই হলো বাকরুদ্ধ সনু। কে যেন তাকে কোলে তুলে নিল। কোথা থেকে যেন চলে এল গোছা গোছা গাঁদা ফুলের মালা। শুরু হলো গলির মোড় থেকে এক শ গজ দূরের বাড়ি পর্যন্ত একটা মিছিল।

মিছিল তো নয়, পা টিপে টিপে এগোনো। অপ্রশস্ত রাস্তার ধারে চুল-দাড়ি কাটার সেলুন, ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের স্তূপ, তেলেভাজার ও মাংসের দোকান এবং ঘুপচি ঘরের পর্দা। সেই রাস্তা থেকে সনুদের বাড়ির সামনের হাততিনেক চওড়া গলির মুখে বুকে নিষ্পাপ মুখের এক শিশুর ছবি ধরে দাঁড়িয়ে চল্লিশ বছরের বিলকিস বানু। চোখ তাঁর ছলছল করছে অথচ মুখে সনুর প্রত্যাবর্তনের আনন্দের রেশ। বুকে ধরা ছবি দেখিয়ে স্পষ্ট বাংলায় বললেন, 'আমার ছেলে আসিফ। বেঁচে থাকলে ছয় বছর বয়স হবে এখন। দেড় বছর হলো সেও চুরি হয়ে গেছে এখান থেকে। থানা-পুলিশ এখনো কিচ্ছুটি করতে পারেনি।'

বিলকিস বানুর এই এক ফোঁটা কষ্টটুকু ছাড়া দিল্লির উত্তর-পূর্ব প্রান্তের নিউ সীমাপুরির এই তল্লাটে আজ কদিন ধরেই কুলকুল আনন্দের স্রোত বয়ে চলেছে। সেই স্রোতে ভেসে চলেছে সনুর অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনের কাহিনি। ছয় বছর আগে এক নিষ্প্রদীপ সন্ধ্যায় পরিচিত এক নারীকে বিশ্বাস করে তার হাত ধরে ঘুরতে গিয়ে দেশছাড়া হয়েছিল সনু। দেশ ছেড়ে বিদেশ। ছয় বছর পর হঠাৎই এ এক বাস্তবের 'বজরঙ্গি ভাইজান'। সিনেমা ও বাস্তবে এ এক অবিশ্বাস্য মিলমিশ! সেই কাহিনি এখন সবার মুখে মুখে।

এরপর পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

দিল্লিতে পরিবারের কাছে সনু

ছয় বছর পর সন্তানকে ফিরে পেয়ে কোলে তুলে নিয়েছেন মা। দিল্লির সীমাপুরিতে নিজের বাড়ির সামনে গতকাল মা মুমতাজ বেগমের কোলে সনু ● ছবি: প্রথম আলো

জামাল ইবনে মুসা

বাংলাদেশের 'বজরঙ্গি ভাইজান'

বাংলাদেশের জামাল ইবনে মুসা, এই কাহিনির যিনি 'বজরঙ্গি ভাইজান', যাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশে মামলা চলছে, তাঁর যেন শাস্তি না হয়। ভারত সরকার যেন তাঁর পাশে থাকে। সুষমা স্বরাজকে সনুর মায়ের অনুরোধ

জিম্মি সংকট নিয়ে এক পৃষ্ঠার বিশেষ আয়োজন : পৃষ্ঠা-৯

পাঠকদের প্রতি

কাতার ও বাহরাইন পাঠকদের শুভেচ্ছা। *প্রথম আলোর* উপসাগরীয় সংস্করণে আমরা আপনাদের প্রবাস-জীবনের কথা, আপনাদের ভালো-মন্দ ও আনন্দ-বেদনা-উৎসবের কথা প্রকাশ করতে চাই। আপনারা সব রকমের কথা আমাদের লিখে পাঠান। এ ছাড়া জানান আপনাদের পরামর্শ। লেখা অবশ্যই পাঠাবেন ইউনিকোডে কিংবা পিডিএফ করে।

যোগাযোগ :
gulfedition@prothom-alo.info

GASTROENTEROLOGY DEPARTMENT

NOW AT
NASEEM AL RABEEH MEDICAL CENTRE
CALL: 333 00 114

You can consult
Dr.Vijay Ramachandran
MBBS, MS (Gen. Surgery), M.Ch (G.I.Surgery,AIIMS), FRCS (Royal College of Surgeons of England)
FUICC (MSKCC, New York), FMAS, FIAGES, UICC Fellow, HPB Service, MSKCC, US
Clinical Fellow, HPB Service, TTSH, Singapore

Visiting Date April 2,3
Time : Morning 9am-1pm
Evening 5pm-9pm

www.naseemalrabeeh.com
NR NASEEM AL RABEEH
Naseem Al Rabeeh Medical Centre
C Ring Road, Opp Gulf Times, Doha - Qatar
Tel: +974 44652121/44655151, Fax: +974 44654490

রম্য রচনা

সারথিনামা বা ড্রাইভারের গল্প

আনিসুল হক

চালককে বলা হয় সারথি। সারথি মানে ড্রাইভার। সারথিনামা মানে গাড়ি চালক বা ড্রাইভারের গল্প।

অনেক দিন হলো সে আমার গাড়ি চালায়। ১৭ বছর বোধ হয় হতে চলল।

আমাদের সহকর্মী সুমনা শারমীন একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার ড্রাইভার কেমন ড্রাইভার? আমি বলি, অসাধারণ!

তাই নাকি?

হ্যাঁ। একদম ডাঁট নাই। কোরবানির গরু কিনে এনে লুঙ্গি পরে পুরো গরু এক ঘণ্টায় বানিয়ে ফেলে। গাছে উঠতে বলে গাছে ওঠে। বাজার করে দিতে বললে বাজার করে আনে। খেতে বললে খায়। না খেতে দিলে মাইন্ড করে না। ওর সব ভালো। শুধু একটা জিনিস খারাপ।

কী জিনিস?

ও গাড়িটা ভালো চালাতে পারে না।

শুনে সুমনা শারমীন মূর্ছা যান আর কী!

যা-ই হোক, ১৭ বছর সে টিকে গেছে। টিকে গেলেই ভালো।

একবার হলো কী আমরা সবাই গেছি কক্সবাজার। পুরো প্রথম আলো পরিবার। স্পেশাল বিমানে করে এসেছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা (প্রয়াত) বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান থেকে শুরু করে অভিনেত্রী বিপাশা হায়াত পর্যন্ত অনেক বিশিষ্টজন। শপথের অনুষ্ঠান। বদলে যাও, বদলে দাও। সারা বাংলাদেশে প্রথম আলো'র গাড়ি গেছে, শপথের গাড়ি, নাগরিকগণ শপথ করেছেন, কে কী ভালো কাজ করবেন, আমরা সেই শপথের ব্যানার প্রচার করব। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকতে আমরা ব্যানার ধরে দাঁড়াব। আর মঞ্চে দেশের বিশিষ্টজনেরা থাকবেন। তাঁরা শপথ বাক্য পাঠ করবেন। সেই শপথ একযোগে দেশের সব টেলিভিশন কেন্দ্র প্রচার করবে। আমি অনুষ্ঠানের উপস্থাপক। *প্রথম আলোর* প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে সেই শপথ বাক্য ছাপা হয়েছে। বিকেল ৫টা ১০ মিনিটে পুরো দেশ থমকে থাকবে। সবাই থাকবেন টিভির সামনে। সবাই শপথ নেবেন। আমরা দেশ গড়ব। নিজে বদলে যাব। দেশকে এগিয়ে নেব।

আমি মঞ্চে উঠেছি। দেশের বিশিষ্টজনেরা উঠেছেন। প্রথমে সম্পাদক মতিউর রহমান সাহেব দুটো কথা বলবেন।

অনুষ্ঠান শুরু করেছি। লাইভ। সারা পৃথিবীর বাংলা ভাষাভাষী মানুষ দেশের চ্যানেলগুলোর কারণে একযোগে অনুষ্ঠান দেখছে। সামনে সুনীল সাগর। সাদা ফেনা মাথায় নিয়ে একটার পর একটা তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে রুপালি সৈকতে। আকাশ সুনীল। মার্চের বালু তাতানো গরম। বাতাস বইছে। গাঙচিল উড়ছে সমবেত হাজারো মানুষের মাথার ওপরে।

আমি খুব উৎকণ্ঠিত। এত বড় অনুষ্ঠানের উপস্থাপক আমি।

> আকাশ সুনীল। মার্চের বালু তাতানো গরম। বাতাস বইছে। গাঙচিল উড়ছে সমবেত হাজারো মানুষের মাথার ওপরে।

অনুষ্ঠান শুরু করলাম। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সাহেব কিছু বলবেন। আমি ঘোষণা করলাম।

এই সময় ফোন বেজে উঠল।

অন্য কারও ফোন হলে ধরার প্রশ্নই আসে না। ড্রাইভারের ফোন। তার মানে কোনো দুর্ঘটনা। স্যার, গাড়ি তো মাইর খাইছে, নাইলে স্যার গাড়িতে তো পুলিশে আটকাইছে। ধরলাম, এই বলো তাড়াতাড়ি। আমি স্টেজে। লাইভ হচ্ছে। কী হয়েছে, তাড়াতাড়ি বলো।

স্যার, বিশাল ঘটনা। আপনেরে টেলিভিশনে দেখাইতেছে। আপনেরে টেলিভিশনে দেখি।

উফফ। কেমন লাগে।

কিছুদিন আগের কথা। আমার ড্রাইভার ফোন করল।

স্যার, আমি ফারমগেট দিয়া যাইতাছি, একলোক তারকাঁটার বেড়ার উপরে দিয়া আইসা আমার গাড়ির সামনে পড়ছে। উপরে ফুটওভারব্রিজ আছিল। সেইটাই না উইঠা তারকাঁটার বেড়া ডিঙায়া সে আমার গাড়ির উপরে পড়ছে।

সর্বনাশ। বেঁচে আছে তো?

হ্যাঁ, স্যার আছে। আমি তারে পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যাই?

পঙ্গুতে না। তুমি ডিএমসি নাও। আমি বলে দিচ্ছি...

না স্যার, সাথে লোক আছে। উনি বলতেছেন পঙ্গুতে নিতে।

আচ্ছা নাও।

একটু পরে ফোন। স্যার, পঙ্গু হাসপাতাল তো নেয় না। বলে ঢাকা মেডিক্যালে নিতে।

আমি বললাম, আমি বলছিলাম তোমারে? নাও।

আমি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে আমাদের প্রতিনিধি এবং আমার ডাক্তার ভাইকে ফোন করে সব রেডি করে রাখলাম।

বন্ধুসভার দুজন গিয়েও দাঁড়িয়ে থাকল।

আহত ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে।

ড্রাইভারের ফোন। স্যার, টাকা লাগব।

বইমেলা চলছে। আমি বললাম, যাও অমুক প্রকাশকের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা নাও। আমি বলে দিচ্ছি।

এক্স-রে হলো। সিটিস্ক্যান। না। আল্লাহর রহমতে হাত-পা কিছু ভাঙেনি। মস্তিষ্কের ভেতরে আঘাত নাই। আল্লাহ বাঁচালেন। ঘণ্টা দুয়েক চলে গেছে।

এরপর আবার ড্রাইভারের ফোন।

হ্যালো, বলো।

স্যার টেলিভিশন ক্যামেরা আইসা ভইরা গেছে। আমার ইন্টারভিউ চাইতাছে। আমি কি স্যার ইন্টারভিউ দিমু?

কী বলো?

আমি কি ইন্টারভিউ দিমু? টেলিভিশন ক্যামেরা আসছে স্যার। চ্যানেল আই, বাংলাভিশন। আপনি কয়া দিলেই স্যার অরা আমার ইন্টারভিউ নিব।

আমার গল্প এখানেই শেষ। কিন্তু আমি আপনাদের জানাতে চাই কাহিনির এক নাম না-জানা চরিত্রের কথা। তিনি শিক্ষিত। আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতেন ভালো ইংরেজিতে। তিনি বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য আহত ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। অথচ তিনি এর আগে কোনো দিনও ওই আহত ব্যক্তিকে চিনতেন না। এই দেশে এ রকম পরোপকারী ভালো মানুষ এখনো অনেক আছেন। যাঁরা নিজেদের মূল্যবান সময় বিনিয়োগ করে নাম না-জানা বিপন্ন মানুষের সেবায় এগিয়ে আসেন। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যান। তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কোথাও আগুন লাগলে পানি নিয়ে এগিয়ে যান। রানা প্লাজা ধসে পড়লে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে আহত চাপা পড়া মানুষকে উদ্ধার করেন। নিজের জীবন বিপন্ন করে ছিনতাইকারী কিংবা ঘাতক কিংবা নারী উত্ত্যক্তকারীকে ধাওয়া করেন।

আমি সেই ইংরেজি জানা পরোপকারী ব্যক্তিটিকে এই রচনার মাধ্যমে সালাম জানাই। তাঁর মাধ্যমে সালাম জানাই দেশের অসংখ্য ভালো মানুষকে, যাঁরা এখনো নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান। তাঁদের জন্যই কবি লিখেছেন, ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ!

ও আচ্ছা, আমিও তো একবার সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলাম।

অবশ্য তখন আমি গাড়িতে ছিলাম না, ছিলাম সিএনজিচালিত ত্রিচক্রযানে।

মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত ঝরছিল।

আমার অ্যাকসিডেন্টের খবরে নিশ্চয়ই অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তবে আমার জানামতে হাউমাউ করে একজনই কেঁদেছিল। সে আমার সেই অতিপুরাতন ড্রাইভার।

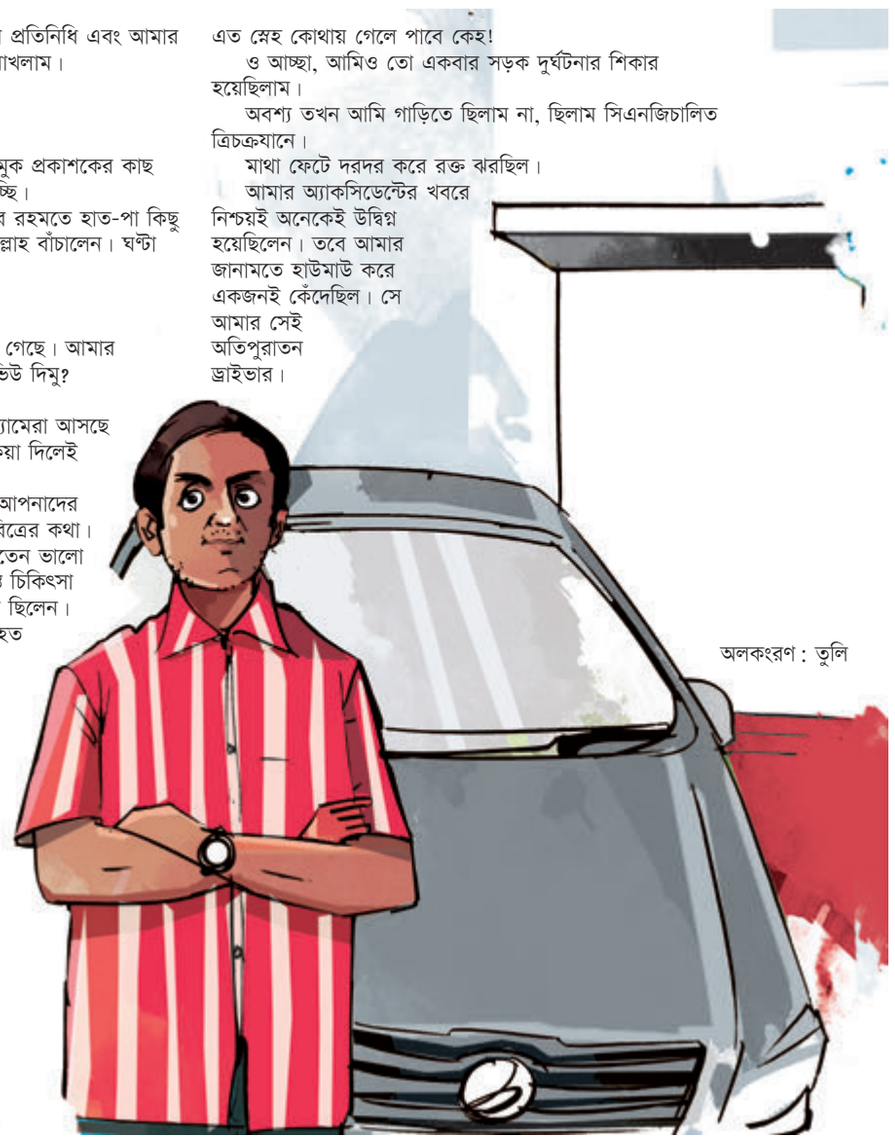

অলংকরণ : তুলি

তারার কবিতা

বিনোদন জগতের তারকা তাঁরা। লেখেন কবিতাও।

অপি করিম
ছবি : প্রথম আলো

অপি করিম

অপেক্ষা

এক শ বছর পর ছুঁতে এলে;
চিলেকোঠাটায় এখনো গোপন অন্ধকার
হাতটা চাই?
নাকি অপার্থিব হাস্যরস?
কিন্তু হায়!
ভয়ংকর শীতল আর স্যাঁতসেঁতে ঘরে
বালিঘড়ির ঐকিক নিয়মের
জটিলতায়;
তোমার জন্য অপেক্ষা-
আমার অসাড় প্রতীক্ষায় রূপ নিয়েছে।

মোশাররফ করিম

আলোয় কালোয় বিভক্ত নিয়মিত

হাতের আদরে ঘুমায় পৃথিবী এক।
হাতেরই চাপড়ে জাগে
চরাচর,
সূর্য ডুবে গিয়ে হাতের-ই ইশারায়
জেগে ওঠে আন্ধার মানিক
তারও হৃদয় আলোয় কালোয় বিভক্ত
নিয়মিত।
আর যখন ভাঙন গড়ায়, নদীর চড়ায়
তখন আমাকে কেন এক হতে বল।
আমার আধেক তো ফেলে এসেছি
আড়িয়াল খার জোছনা-গোলা জলে
গলায় ঝোলানো এক থোকা
তাবিজে
কামরাঙার কচি পাতায়
ও মন, ও গোপন বন্ধু ও শেষ সখা
তুমি একবার শেষবার আমার
শরীরে বুলাও হাত।

মোশাররফ করিম
ছবি : প্রথম আলো

ঈদের সেমাই

বিশেষ

ফরহাদ খান

সে সেমাই কি আরবি-ফারসি শব্দ? না। সেমাই কি বিশুদ্ধ মুসলমানি খাবার? তাও না। তারপরও সেমাই ছাড়া বাঙালি মুসলমানের ঈদুল ফিতর কল্পনাই করা যায় না।সেমাইয়ের সঙ্গে ঈদুল ফিতরের সম্পর্কটা কীভাবে তৈরি হলো তার হদিস পাওয়াটাও বেশ মুশকিল। বাঙালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ছিটেফোঁটা মধ্যযুগের ইতিহাস গ্রন্থে যেটুকু পাওয়া যায় তার মধ্যে সেমাইয়ের উল্লেখ নেই। কিন্তু ফিরনির আছে। নবাব আলিবর্দী খাঁর খাদ্য তালিকায় খিচুড়ির উল্লেখযোগ্য অবস্থান ছিল। সেমাইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় না মোগল রসুইঘরেও। অর্থাৎ সেমাই মোগলাই খাবারের মধ্যে পড়ে না।

মধ্যযুগের সাহিত্যে অনেক খাবারের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সেমাইয়ের নাম কোথাও নেই।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষাতে সেমাইয়ের নাম একেক রকমের। বাংলা অবশ্য সেমাই। তবে হিন্দি, উর্দু ও পাঞ্জাবিতে সেমিয়া অথবা সেভিয়াঁ। মারাঠিতে বলে সেমাইয়া, গুজরাটিতে সেই এবং তেলেগু, তামিল ও মালায়লামে সেমিয়া।

ভারতের অনেক অঞ্চলে অবশ্য সেমাইয়ের দুই রূপ—এক হলো নামকিন সেমাইয়া, অন্যটা হলো সেমিয়া সেভিয়াঁ ক্ষীর। অর্থাৎ তা মিষ্টি। বাংলাদেশের সেমাইয়ের স্বাদ একটাই—আর তা হলো মিষ্টি।

বাঙালি সেমাই ভিন্ন নামে আছে গ্রিসে। আছে আফ্রিকার সোমালিয়াতেও। সেখানে তার নাম কাদ্রিয়াদ। বাংলাদেশে শুধু ঘি দিয়ে ভেজে যেভাবে দমে সেমাই রান্না হয়, সোমালিয়ার কাদ্রিয়াদ রান্নার প্রণালি সেই একই রকম। সেমাইয়ের কাছাকাছি কিছু পদ পাওয়া যাবে ইরান ও তুরস্কেও। নাম অবশ্য ভিন্ন। বাংলা অভিধানে সেমাই শব্দটাকে কোথাও বলা হয়েছে হিন্দি, কোথাও বলা হয়েছে দেশি। ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, গ্রিক শব্দ সেমিদালিস থেকে সেমাই শব্দের উৎপত্তি। তবে ব্যাপারটা সরাসরি ঘটেনি। সেমিদালিস শব্দের মূল অর্থ হলো ময়দা। ময়দা অবশ্য ফারসি শব্দ। যা হোক, এই সেমিদালিস শব্দ সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ করে সমিদা রূপ ধারণ করে। সমিদা থেকেই তৈরি হয় সেমাই, সেমিয়া ইত্যাদি শব্দ এবং এইসব নামের মিষ্টান্ন দ্রব্য।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের মধ্য দিয়ে গ্রিসের সঙ্গে ভারতের পরিচয় ঘটে। সেই সময় খাদ্যদ্রব্য হিসেবে সেমিদালিস বা ময়দার সঙ্গে ভারতের পরিচয় ঘটা বিচিত্র নয়। সেমিদালিসের সমিদা হওয়া এবং সমিদা থেকে সেমাই হওয়া ভাষাতত্ত্বে নতুন কোনো ঘটনা নয়। শব্দের পথ ধরে ইতিহাসের দিকে এগোনো যায়। শব্দের চাবি দিয়ে খোলা যায় ইতিহাসের অনেক দরজা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সেমাই শব্দের বুৎপত্তি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিয়েছেন—সেমাই শব্দের গায়ে গ্রিসের গন্ধ থাকলেও সেমাই দ্রব্যটা আসলে ভারতীয়। ভারতের অনেক রাজ্যেই সেমাই নানাভাবে খাওয়া হয়। বিভিন্ন পালাপার্বণেও সেমাই রান্নার রেওয়াজ রয়েছে। তা ছাড়া, উপমহাদেশের মুসলমানমাত্রই ঈদের দিনে সেমাই খায়। পাকিস্তানেও সেমাই ছাড়া ঈদ হয় না। সেমাইয়ের ইংরেজি নাম পাওয়া যায় ভারমিসেলি। স্বাদ ও রন্ধনপ্রণালির দিক থেকে সেমাইয়ের স্বাদ ভারমিসেলি বা ভারমিচেল্লির কোনো সম্পর্ক নেই। মিল রয়েছে শুধু চেহারায়। ঈদে সেমাই অপরিহার্য হলেও সুদূর মফস্বল বা গ্রামে সত্তর-আশি বছর আগে প্যাকেটজাত রেডিমেড সেমাই সহজলভ্য ছিল না। বাড়ির মহিলাদের হাতে তখন তৈরি হতো আদি অকৃত্রিম ঈদের সেমাই। তাঁরা সেমাই বলতেন না। বলতেন সেমুই, সিমুই, সিউই বা সেঁউ। ঈদের কয়েক দিন আগে থেকেই বাড়িতে বাড়িতে সেমাই তৈরি শুরু হয়ে যেত। মাটির হাঁড়ি কিংবা কলসি উপুড় করে হাতের অপূর্ব দক্ষতায় ময়দার লেই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁরা নামাতেন ময়দার সুতো বা সেমাই। চালের আটার টুকরো সেমাই তৈরি হতো পিঁড়িতে হাত ঘুরিয়ে। পরে এল পিতলের তৈরি সেমাইকল। কয়েকটা ছাঁচ ছিল সেই কলে—মোটা, মাঝারি ও মিহি। সেমাইকলের হাতল ঘোরানো শ্রমসাধ্য ব্যাপার ছিল। হাতল ঘোরানোর দায়িত্ব পড়ত ছোটদের ওপর। ব্যাপারটা তাদের কাছে নিরানন্দের ছিল না।

সেমাই এখন দুই প্রকারের। তার সেমাই বা খিল সেমাই। আরেকটা হলো লাচ্ছা বা লাচ্চি সেমাই। এ সেমাইয়ের প্রকরণ আলাদা। আগে পাওয়া যেত ঘিয়ে ভাজা। এ সেমাইয়ের উৎপত্তি কোথায় তা জানা যায় না। নামটা লাচ্ছা হলো কেন তাও বলা মুশকিল। আরবি লম্বুতদার শব্দ ঢাকার আদি বাসিন্দাদের মুখে উচ্চারিত হতো লাচ্ছাদার। লম্বতদার শব্দের অর্থ সুস্বাদু। লাচ্ছাদার মানেও তা-ই। হতে পারে এই লাচ্ছদারই লাচ্ছি হয়ে সেমাইয়ের আগে বসে গেছে। আবার, এমনও হতে পারে লাচ্ছা সেমাইয়ের উদ্ভবই ঢাকাতে—ঢাকায় আগত অবাঙালিদের দ্বারা অথবা আদি ঢাকাইয়াদের হাতেই।

ঈদ ইনিংস

কেমন কাটবে আপনার প্রিয় ক্রিকেট তারকার এবারের ঈদ? জানাচ্ছেন তৌহিদা শিরোপা ও রানা আব্বাস

ছবি : প্রথম আলো

মাশরাফি বিন মুর্তজা

প্রাণের বন্ধুর আড্ডায়

ঈদ ভাবনা নিয়ে জানতে চাইলে মাশরাফি বিন মুর্তজার প্রশ্ন, '১৫ বছর ধরে একই কথা বলছি, নতুন করে কী বলার আছে?' এরপর তাঁর রসিকতা, 'আগেরগুলো দেখে লিখে দিন!'

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রায় ১৫ বছর কাটিয়ে দিলেন মাশরাফি। প্রায় প্রতিবছরই ঈদ নিয়ে তাঁকে কিছু না কিছু বলতে হয়েছে। আসলেই নতুন করে বলার কী আছে! এবারও ঈদ নিয়ে তাঁর ভাবনায় খুব একটা পরিবর্তন নেই। যেহেতু খেলার ব্যস্ততা নেই, দুই দিন আগে স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে যাবেন নড়াইলের বাড়িতে।

ঈদের সকালে মামা নাহিদুর রহমান, ছোট ভাই মুরসালিন বিন মুর্তজার সঙ্গে যাবেন নামাজ পড়তে। বাবা গোলাম মুর্তজা অবশ্য ঈদের নামাজ পড়েন তাঁদের গ্রামের বাড়ি চারখাদায়। মাশরাফি জানালেন, দাদা-দাদির কবর আছে, এ কারণে বাবা নামাজ পড়েন সেখানে।

সাধারণত বিকেল পর্যন্ত পরিবারকে সময় দেবেন মাশরাফি। স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ঘুরতে বের হবেন কি না নিশ্চিত নন। তাঁর ঈদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে আড্ডা! বাসার সামনে বন্ধুদের সঙ্গে চলবে ধুমসে আড্ডাবাজি। নড়াইলে ঈদ করলে মাশরাফির আড্ডাসঙ্গী হন সাধারণত রাজু, ওয়াসিম, সাজু, সুমন, কমল, মানস—এ মানুষেরাই তাঁর প্রাণের বন্ধু।

প্রথাগত কেনাকাটায় আগ্রহ নেই মাশরাফির। রচনাটা যখন লেখা হচ্ছে তখনো পরিবারের জন্য কিছুই কেনেননি। কেনাকাটার সে রকম পরিকল্পনা নেই বলেও জানালেন। তাঁর ঈদ পোশাকেও নেই জাঁকজমক কিছু। নামাজের পর পাঞ্জাবি আর লুঙিতেই হয়তো কাটিয়ে দেবেন দিনটা।

মাশরাফির কাছে এখনকার ঈদ কীভাবে ধরা দেয়? সময়ের সঙ্গে বদলেছে তাঁর আনন্দের রং, 'একটা সময় খুব হইচই করতাম। এখন সন্তানেরা করে, আমরা দেখি।'

মাহমুদউল্লাহ

বাড়ি ফেরার আনন্দ

ঈদ এলেই ময়মনসিংহ শহরের বাড়িটা যেন ফিরে পায় পুরোনো পরিবেশ। সারা বছর কর্মব্যস্ত ছেলেরা ফেরেন বাড়িতে। আরাফাত বেগম ও মো. উবায়েদউল্লাহর চোখে-মুখে খেলে যায় খুশির ঢেউ। তাঁদের বড় ছেলে আহসানউল্লাহ, মেজ ছেলে এমদাদউল্লাহ তো আছেনই; বাড়ির আনন্দ যেন দ্বিগুণ করে দেন ছোট ছেলে মাহমুদউল্লাহ!

প্রায় সারা বছরই মাহমুদউল্লাহকে ব্যস্ত থাকতে হয় খেলা নিয়ে। ভাইয়েরাও ব্যস্ত থাকেন যাঁর যাঁর পেশা নিয়ে। ঈদের সময়টাতে যা একটু ফুরসত মেলে সবার। মাহমুদউল্লাহ জানালেন, এ সময় তাঁদের বাড়ির চেহারাটাই যায় বদলে, 'ঈদে বাড়ির পরিবেশ অন্য রকম হয়ে যায়। আগের আমেজটা ফিরে আসে।'

ঈদের দিনের রুটিনটা অবশ্য মাহমুদউল্লাহর সব সময়ই এক। মা ঘুম থেকে ওঠাবেন। বাবা-ভাইদের সঙ্গে নামাজ পড়তে যাবেন। এরপর খাওয়া-দাওয়া, খানিকটা বিশ্রাম। বিকেলে হয়তো স্ত্রী জান্নাতুল কাউসার ও ছেলে রায়ীদকে নিয়ে ঘুরতে বেরোবেন।

তবে মাহমুদউল্লাহ চাইলেও পারেন না ইচ্ছেমতো ঘুরতে। যেখানেই যান মুহূর্তে জমে যায় মানুষের ভিড়। এ কারণে অনেক সময় অস্বস্তিতে পড়তে হয় তাঁর পরিবারকে, 'আগের মতো ঘুরতে পারি না। তবে আমার চেয়ে বেশি অস্বস্তিতে পড়ে পরিবারের সদস্যরা।'

গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টেস্ট সিরিজের কারণে চট্টগ্রামে ঈদ করতে হয়েছিল মাহমুদউল্লাহকে। তবে বাংলাদেশ দলের এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানকে কখনো বিদেশে ঈদ করতে হয়নি। এবার অবশ্য নেই ঘরোয়া কিংবা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ব্যস্ততা। অসাধারণ ঈদই হবে মাহমুদউল্লাহর। ঈদটা আরও রঙিন করতে বিশেষ পরিকল্পনা আছে তাঁর, 'এবার ঈদ একটু স্পেশাল হবে। ঈদের পরপরই স্ত্রী-বাচ্চাকে নিয়ে যাব দেশের বাইরে ঘুরতে।'

তামিম ইকবাল

রোমাঞ্চকর ঈদ

আরহামের কারণে এবারের ঈদ খুব স্পেশাল তামিম ইকবালের কাছে। আরহাম ইকবাল তামিমের চার মাস বয়সী ছেলে। এ বছর দুজন থেকে তিনজন হয়েছেন তাঁরা। তাই নতুন বাবা তামিম খুব রোমাঞ্চিত। যদিও এখনো ঠিক করতে পারেননি এবারের ঈদ কোথায় করবেন। 'চট্টগ্রামে সবাই মিলে ঈদ করা আমাদের পরিবারের বহু বছরের ঐতিহ্য। কিন্তু এবার ঈদে পরিবারের অনেক সদস্য দেশের বাইরে ঈদ করছেন। সবাই যখন থাকছেন না, তাই আমারও একটা পরিকল্পনা আছে দেশের বাইরে ঈদ করার। ব্যাংকক বা দুবাই—কোথায় করব, সিদ্ধান্ত নিইনি। আবার এমনও হতে পারে, চট্টগ্রামেই ঈদ করলাম।' বলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের তারকা খেলোয়াড় তামিম ইকবাল।

ঈদের সময় তামিম তাঁর বাবাকে খুব মিস করেন। ছোটবেলার ঈদগুলোতে বাবার সঙ্গে কত আনন্দ করতেন। বাবার আদর্শ, মূল্যবোধ—এগুলো তামিম সব সময় মনে রাখেন। তিনি চান, আরহামের মনেও যেন বাবা তামিমের প্রতি সেই শ্রদ্ধা, ভালোবাসা থাকে। ছেলের সঙ্গের কাটানো প্রতিটি মুহূর্তই বিশেষ তামিমের কাছে।

একটা মজার গল্প বললেন এই বাবা। তামিম একনাগাড়ে বেশিক্ষণ খেলতে পারেন না আরহামের সঙ্গে। এঘর-ওঘর ঘুরে ওর সঙ্গে খুনসুটি করেন। সেই সময় আরহাম খিলখিল করে হাসে। এতে রেগে যান আয়েশা। গাল ফুলিয়ে বলেন, সারাক্ষণ কোলে নিয়ে থাকা, রাত জাগা—সব আমিই করি। আর বাবাকে দেখলেই খুশি। এই হাসি তো মায়ের সঙ্গে দেয় না।' এতে খুব মজা পান তামিম।

আয়েশা সিদ্দিকা ও আরহামের সঙ্গে খুব একটা সময় কাটাতে পারেন না ব্যস্ত ক্রিকেটার তামিম। ঈদের ছুটি তাই পুরোপুরি তাদের জন্য। তামিমের কাছ থেকে জানা গেল, কেনাকাটার দায়িত্ব মা আয়েশার। নতুন মায়ের জন্য কী উপহার কিনবেন? বললেন, 'আয়েশা ও আরহামুর জন্যই তো সব। আরহামকে আমি আর আয়েশা আদর করে আরহামু ডাকি। আয়েশার জন্য বিশেষ কিছু একটা তো থাকবেই। সেটা নয় গোপনই থাকল। তা না হলে চমক থাকবে না তো।'

সাব্বির রহমান

ঈদের সেলামি

রাজশাহী ছাড়া অন্য কোথাও ঈদ ভালো লাগে না। সাব্বির রহমানের কাছে ঈদ মানেই রাজশাহীর ঈদ। অন্য কোথাও ঈদ করার কথা ভাবতে পারেন না। খেলা থাকলে অবশ্য ভিন্ন কথা। মা-বাবা, ভাই, বন্ধুদের নিয়ে কাটে সাব্বিরের ঈদ। বাড়ির ছোট ছেলে সাব্বির। পরিবারের সবার জন্য ঈদের কেনাকাটা ঢাকায় করেন তিনি। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কেনাকাটা সেরে গিয়েছেন রাজশাহী।

'প্রতিবার ঈদে নামাজ পড়ে ঘুরতে বের হই। এবারও তাই করব। সব সময় প্রিয় বাইকে চড়েই ঘোরাঘুরি করি। গাড়ি চালানো শিখে গিয়েছি। এবার সবাইকে নিয়ে গাড়িতে চড়ে ঘুরব।' বলেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার সাব্বির রহমান।

সাব্বিরের ঈদ আক্ষরিক অর্থেই তিন দিনের হয়। প্রথম দিন শুধু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুদের সঙ্গে কাটাবেন। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ঈদের পরদিন বন্ধুদের সঙ্গে এলাকার কোনো বড় ভাইয়ের বাংলোবাড়ি বা আশপাশে কোথাও ঘুরতে যান। এই দিনটি শুধুই বন্ধুদের জন্য। ঈদের তৃতীয় দিন চাচাতো, মামাতো ভাইবোনরা সব চলে আসে তাঁদের বাড়িতে। পুরো বাড়িতে হইহুল্লোড়, আড্ডা লেগে থাকে।

এখনো নানির কাছে ঐতিহ্য অনুযায়ী দুই টাকা সালামি পান। মা-বাবা, বড় ভাই, ভাবির কাছ থেকে সালামির টাকা বেড়েছে। কিন্তু সাব্বিরও সালামি দেওয়া থেকে রেহাই পান না। দুই ভাতিজা, ছোট খালাতো-মামাতো ভাইবোনদের সালামি দিতে হয় তাঁকে।

মুস্তাফিজুর রহমান

'বড়' মুস্তাফিজের ঈদ

এবারও আবুল কাসেম গাজী ও মাহমুদা খাতুন থাকবেন অপেক্ষায়—কবে বাড়ি ফিরবে তাঁদের ছোট ছেলে মুস্তাফিজুর রহমান। বড় ছেলে মাফুজার রহমান থাকেন খুলনায়; ঈদের ছুটি শুরু হলেই তিনি ফিরবেন। মেজো ছেলে জাকির হোসেন ও সেজো মোখলেছুর রহমান তো বাড়িতেই থাকেন। অপেক্ষা শুধু মুস্তাফিজের জন্য।

মুস্তাফিজের ঈদের ছুটি শুরু কবে? নিশ্চিত নন মুস্তাফিজ নিজেও। আইপিএল থেকে চোট নিয়ে ফেরা বাংলাদেশ দলের এই বাঁহাতি পেসারের চলছে পুনর্বাসন-প্রক্রিয়া। তবে মুস্তাফিজের ঘনিষ্ঠরা জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ি যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেটি হতে পারে আজই।

গত রোজার ঈদে বাড়িতে যাওয়া হয়নি মুস্তাফিজেরও। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টেস্ট সিরিজ থাকায় ঈদ করতে হয়েছে চট্টগ্রামে। এবার যেহেতু বাংলাদেশের খেলা নেই, নিশ্চয়ই ঈদ করতে হবে না বাড়ির বাইরে!

বাড়ি গেলে মুস্তাফিজের ঈদ কাটবে আগের মতোই। ঘুম থেকে উঠে মায়ের হাতে সেমাই খাওয়া। এরপর বাবা ও ভাইদের সঙ্গে ঈদের নামাজ পড়তে যাওয়া। বিকেলে প্রতিবারের মতো এবারও পরিকল্পনা আছে বাড়ি থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে নানাবাড়িতে যাওয়ার। যেহেতু বাড়ির সবচেয়ে ছোট ছেলে, আগে অনেক সালামি পেতেন। কিন্তু এখনকার ছবি কিছুটা ভিন্ন। মুস্তাফিজ 'বড়' হয়ে গেছেন! তাঁকেই সালামি দিতে হয় ছোটদের।

আগে স্বাধীনভাবে যেকোনো জায়গায় ঘুরতে পারতেন মুস্তাফিজ। কিন্তু এখন সে উপায় নেই। বাধ্য হয়েই ঘোরাঘুরি করতে হয় অনেক বেছে। যদিও কোথাও যান, সঙ্গে থাকবেন ভাইয়েরা।

অমিতাভ বচ্চন সম্পর্কে দু-চারটে কথা | সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

> কয়েকটা বিষয় নিয়ে আমার বিস্ময় আজও কাটল না। অমিতাভও কোনো দিন এই বিস্ময়গুলো ঘোচানোর চেষ্টা করেননি।

অমিতাভ বচ্চনকে একবার বলেছিলাম, আপনি বেশ 'কনজারভেটিভ'। কথাটা শুনে উনি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন। সেই চাউনিতে বিস্ময় ছিল। প্রশ্নও।

মনে হওয়ার দু-একটা কারণ আমি তাঁকে শুনিয়েছিলাম। শোনা শেষ করে তিনি বলেছিলেন, তোমার চোখে যা কনজারভেটিভ, আমার কাছে তা ট্র্যাডিশনাল। ওঁর উত্তর শুনে মনে মনে বলেছিলাম, যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্নর মতোই তাঁর কাছে যাহা কনজারভেটিভ তাহাই ট্র্যাডিশনাল।

ইদানীং আমাদের দেখা ও কথা হয় কালেভদ্রে। তবে প্রায়ই ওঁকে নিয়ে মিডিয়ায় চর্চা হয়। ওঁকে নিয়ে বিস্তর লেখাটেখাও চোখে পড়ে। কখনো-সখনো ওঁর 'ব্লগ' পড়ি। ইন্টারভিউ দেখি। সব সময়ই মনে হয় উনি আর পাঁচজনের চেয়ে আলাদা। এবং আলাদা বলেই এখনো এই বয়সে এ ধরনের কদর পেয়ে আসছেন। আট থেকে আশির কাছে।

আর মনে হয়, আমিও নই উনিও নন, আমরা দুজনেই ঠিক। অমিতাভ বচ্চন একাধারে কনজারভেটিভ ও ট্র্যাডিশনাল। এটা যেমন তিনি নিজে, তেমনই তা তিনি তাঁর পরিবারের সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। অবশ্যই জবরদস্তি করে নয়।

মুম্বাইয়ের ফিল্মি দুনিয়া অনেকটা পশ্চিমি দুনিয়ার মতো। ইউরোপ-আমেরিকায় ছেলেমেয়েরা সাবালক হয়ে গেলেই আলাদা আলাদা হয়ে যায়। মা-বাবার সংসার থেকে আলাদা। সপ্তাহান্তে একদিন একবেলার জন্য গেট টুগেদার হলে সেটাই হয় ঠাসবুনোট পরিবারের সংজ্ঞা। মুম্বাইয়ের ফিল্মি জগৎও অনেকটা ও রকম। একটা কি দুটো ছবি হিট হয়েছে তো নায়ক-নায়িকা মা-বাপকে ছেড়ে আলাদা থাকতে শুরু করে। তৈরি করে নেয় আলাদা জগৎ। অমিতাভকে কিন্তু সেই রাস্তায় হাঁটতে দেখা যায়নি। নামে, যশে, অর্থে, ক্ষমতায়, প্রতিপত্তিতে তাঁর মাথা আকাশ ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে উঠলেও মা-বাবার সান্নিধ্য ছেড়ে তিনি আলাদা থাকতে যাননি। বাবা হরিবংশ রাই বচ্চন যত দিন বেঁচে ছিলেন, ছেলের সঙ্গেই ছিলেন। মা তেজী বচ্চনও তাই। ছেলে-বউ-নাতি-নাতনিদের সঙ্গছাড়া তাঁদের হতে দেননি। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতনিকে নিয়ে অমিতাভও এখন তৃপ্ত। 'প্রতীক্ষা' ও 'জলসা' দুটি ভিন্ন বাড়ি হতে পারে, কিন্তু সংসার একটাই। আর সেই সংসারের শেষ কথা এখনো তিয়াত্তরের এই নবীন কর্মঠ মানুষটি।

ইংরেজিতে যাকে বলে 'আপব্রিঙ্গিং' বচ্চন পরিবারে সেটা এখনো দুর্দান্ত। হরিবংশ রাই বচ্চন ছেলেদের যে শিক্ষা দিয়েছেন, ছেলেরা তা শুধু মেনেই চলেননি, পরের প্রজন্মের মধ্যেও তা ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। নইলে এই সেদিন অভিষেক বচ্চন এক সাক্ষাৎকারে বলতেন না, 'ঘরের বিষয় আমরা ঘরেই রাখি, বাইরে টেনে আনি না।' ঠিক যেন বাবার কথা ছেলের মুখে বসানো। রেখাকে নিয়ে অমিতাভের সংসারে যখন ঘোর অশান্তি চলছিল, তখনো পারিবারিক সেই টানাপোড়েনকে তাঁরা বাইরে আসতে দেননি। অথচ কোন পরিবার ভাঙছে, কোনটা গড়ছে, মুম্বাইয়ের মানুষ তা প্রথম জানতে পারে গসিপ ম্যাগাজিন মারফত। বচ্চন পরিবারের মতো ব্যতিক্রমী যৎসামান্যই।

ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্য আসলে এটাই। অমিতাভ মনে করেন পরিবারের কনসেপ্টটা এককথায় দুর্দান্ত। সবাই একসঙ্গে থাকলে আনন্দ অনেকগুণ বেড়ে যায়। আবার দুঃখকষ্টও ভাগাভাগি হয়ে যায়। তাঁর কাছে বাবা ও মা হলেন সাক্ষাৎ ধ্রুবতারা। ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ঠিক-বেঠিক, ন্যায়-অন্যায়ের হদিস তাঁরাই দিতে পারেন। কারণ বয়স একটা সংখ্যা নয়। বয়স আসলে অভিজ্ঞতা। বই পড়লে অনেক কিছু হয়তো জানা যায়, কিন্তু জ্ঞানী হওয়া যায় না। তার জন্য প্রয়োজন জীবনকে দেখা, বোঝা, জানা ও অভিজ্ঞ হওয়া। প্রবীণদের কাছে থাকলে সেটা অর্জন করা যায়। তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মকে ঋদ্ধ করেন।

কয়েকটা বিষয় নিয়ে আমার বিস্ময় আজও কাটল না। অমিতাভও কোনো দিন এই বিস্ময়গুলো ঘোচানোর চেষ্টা করেননি। কেন হঠাৎ তিনি নিরামিষাশী হয়ে গেলেন, সিগারেট ও মদ্যপান ছেড়ে দিলেন, কোনো দিনই কারও কাছে তা ব্যাখ্যা করেননি। অনেকবার জানতে চেয়েছি। উনি ঠোঁট উল্টে বলেছেন, এমনিই। বিস্মিত হই যখন শুনি, কোনো কোনো রাতে দু-আড়াই ঘণ্টা ঘুমিয়েও তিনি পরের দিন ১০ ঘণ্টা শুট করেন। যেদিন থেকে ব্লগ লেখা শুরু করেছেন, একটা দিনের জন্যও কামাই করেননি। ব্লগ পোস্ট করার সময়টাও তিনি প্রতিদিন এক কোনায় লিখে দেন। রাত একটা-দেড়টা তো হরবখত, কত দিন হয়েছে ভোর চারটেয় ব্লগ লিখে ছয়টায় শুটে বেরিয়ে গেছেন। যেদিন লিখতে পারছেন না, সেদিনটাও তিনি বাদ দেন না। লিখতে ভোলেন না, 'আজ বড় ব্যস্ততায় গেল। ক্লান্তিতেও। আমার প্রিয় ই এফ, আজ ক্ষমা করবেন। কাল নিশ্চয় বেশি কথা বলতে পারব।'

এই 'ই এফ' আজ অমিতাভের সবচেয়ে কাছের জন। ই এফ মানে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি। লাখ লাখ ফলোয়ারের মধ্যে কত সহস্র তাঁর ই এফ সদস্য ভাবতে গেলে সেটাও বিস্ময় জাগায়। নিজের ভাবনা-চিন্তা এঁদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত শেয়ার করেন। ভাষার ওপর তাঁর দখল এতটাই যে বহু মানুষ জানতে চান ব্লগের লেখা তিনি নিজে লেখেন নাকি তাঁর হয়ে লিখে দেওয়ার জন্য মাস-মাইনে করা লেখক আছে!

বহু বছর আগে বোফোর্স কেলেঙ্কারির সময় মিডিয়ার বিচারে যখন তিনি 'চোর' সেজে গিয়েছিলেন, সে সময় একদিন আক্ষেপ করে আমায় বলেছিলেন, 'পরের জন্মে আমি সাংবাদিক হতে চাই। কেননা সাংবাদিকেরা যা খুশি তাই লিখতে পারে। রাজা-উজির মারতে পারে। কোথাও কোনো দায়বদ্ধতা তাদের নেই।' ব্লগের ভাষার মুনশিয়ানায় বিস্মিত হয়ে একবার বলেছিলাম, সাংবাদিক তো হতেই পারতেন, সাহিত্যিক হলেও আপনি সমান খ্যাতি পেতেন। প্রশংসাটুকু তিনি গায়ে মাখেননি। কিন্তু যখন বলি, আপনি পেশাগত সাংবাদিক না হয়েও যথার্থ সাংবাদিক, তখন ভ্রু কুঁচকে তাকিয়েছিলেন। আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম, ঐশ্বরিয়ার মা হওয়ার খবরটা আপনারই 'ব্রেকিং নিউজ' ছিল। কাকপক্ষীকেও পর্যন্ত আগাম জানতে দেননি।

মানুষ হিসেবে তিনি কেমন, কতটা ভালো, কতখানি মন্দ—এই প্রশ্ন এখনো বহু মানুষের মনে পানাপুকুরের মতো বিজগুড়ি কাটে। কেউ কেউ মনে করেন লোকটা খুব ধুরন্ধর। আবেগের বশে চলেন না। প্রতিটা পা ফেলেন হিসাব কষে। এটা যদি হয়েও থাকে, তাহলে সেটা খারাপ হবে কেন সেই প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে। মুম্বাইয়ের মতো পেছল শিল্প-শহরে একবার পা হড়কালেই তো অক্কা। সেখানে ক্ষুরধার কম্পিটিশনের বাজারে হিসেবি হওয়াটা খারাপ হবে কেন? অনেকের ধারণা, তাঁর নাকি দান-ধ্যান কম। একবার সরাসরি এ নিয়ে জানতে চেয়েছিলাম। অমিতাভ গম্ভীরভাবে জবাব দিয়েছিলেন, দান করে ঢাক পিটিয়ে মহত্ত্ব প্রচারে আমি অপারগ। চ্যারিটি নীরবেও করা যায়। টাকা ও যশ পেয়েও নানা প্রলোভনে চক্করে পড়ে কত মানুষ যে বিনোদনের এই মক্কায় স্রেফ ভেসে গেছেন, তা কর গুনে শেষ করা যাবে না। সে জায়গায় অমিতাভ এখনো অনির্বাণ। কী করে? উত্তরটা রয়েছে ওই ছোট্ট ইংরেজি শব্দটায়, 'আপব্রিঙ্গিং'।

তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন ও বিস্ময় এখনো অপার। প্রশ্ন আমার মনেও যে নেই তা নয়। জীবনের এত ঘাত-প্রতিঘাত যিনি সয়েছেন, জীবনকে এত দিন ধরে যিনি দেখছেন, মনের এত কথা যিনি প্রতিদিন লিখে ফেলেন, কেন তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কোনো মতামত দেন না? এমন নয় যে তিনি টুইট করেন না। এমন নয় যে তিনি ফেসবুকে নেই। এমনও নয় যে তিনি ব্লগ লেখেন কালেভদ্রে। তাহলে কেন জানা যায় না ললিত মোদি বা বিজয় মালিয়াদের লুট নিয়ে তাঁর অভিমত? সালমান খান বা সাইফ আলী খানদের মামলার ফয়সালা কেন বছরের পর বছর কেটে গেলেও হয় না কিংবা সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসাজশ সত্ত্বেও কেন সঞ্জয় দত্তর গুরু পাপে লঘুদণ্ড হয় অথচ ওই এক মামলায় গাদা গাদা অনামী গরিব মানুষ এখনো জেলেই পচছে, অনেকে সেই প্রশ্ন তুললেও তিনি মৌন থাকেন। এই যে রঘুরাম রাজনের মতো আপাদমস্তক ভদ্র ও বিশ্ববন্দিত অর্থনীতিবিদকে অপমানিত হয়ে সরে যেতে হচ্ছে, সে বিষয়েও অমিতাভের কোনো মতামত নেই। জাভেদ আখতার বহুদিন আগে আমাকে বলেছিলেন, অমিতাভও আর পাঁচজনের মতো রাগেন, কষ্ট পান, অপমানিত হন, আনন্দিত হন। কিন্তু আবেগের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় না। কতটা এগোনো উচিত বা কোথায় থামা দরকার, অমিতাভের কাছ থেকে তা শেখার।

ইংরেজিতে একেই হয়তো বলে 'পলিটিক্যালি কারেক্ট' থাকা। রাজনীতি থেকে সরে গিয়েও নিজের 'কারেক্ট পজিশন' তিনি ধরে রেখেছেন। বাঙালি হলে হয়তো রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় নিয়ে জবাব দিতেন, এই বিশ্ব সংসারের ভালো-মন্দের ভার আমার ওপরে কেউ ছাড়েনি।

চুপি চুপি বলি, এত পেয়েও কিন্তু এই তিয়াত্তরে তরতরিয়ে চলা মানুষটি ভয়ানক ভীতু। ভয় কাজ না পাওয়ার, প্রচারের আলো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার, অন্তরালে চলে যাওয়ার। সিনেমা না করে, ডায়ালগ না বলে, এলেবেলে হয়ে বেঁচে থাকতে তাঁর ঘোর অনীহা। নিজেকে নিরন্তর ভেঙেচুরে প্রাসঙ্গিক থাকার তাই এত প্রাণপণ প্রচেষ্টা। নইলে এই বয়সে কে একটু আয়েশে-আলসেমিতে গা ভাসাতে চায় না? অথচ তিনি অমিতাভ বচ্চন। প্রতিদিন ঘুম ভেঙে তিনি ভাবেন, এই নতুন দিনটাকে নতুনভাবে কী করে ব্যবহার করা যায়। নিজের কাছে নিত্যদিন নিজেই খাড়া করেন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ। অমিতাভ বচ্চনকে কেউ যদি প্রশ্ন করেন, এই জীবন সায়াহ্নে কোনটা তাঁর প্রিয় ইচ্ছে, আমি বাজি ধরে বলতে পারি, উনি বলবেন, 'এইভাবে কাজ করতে করতে যেন চলে যেতে পারি।'

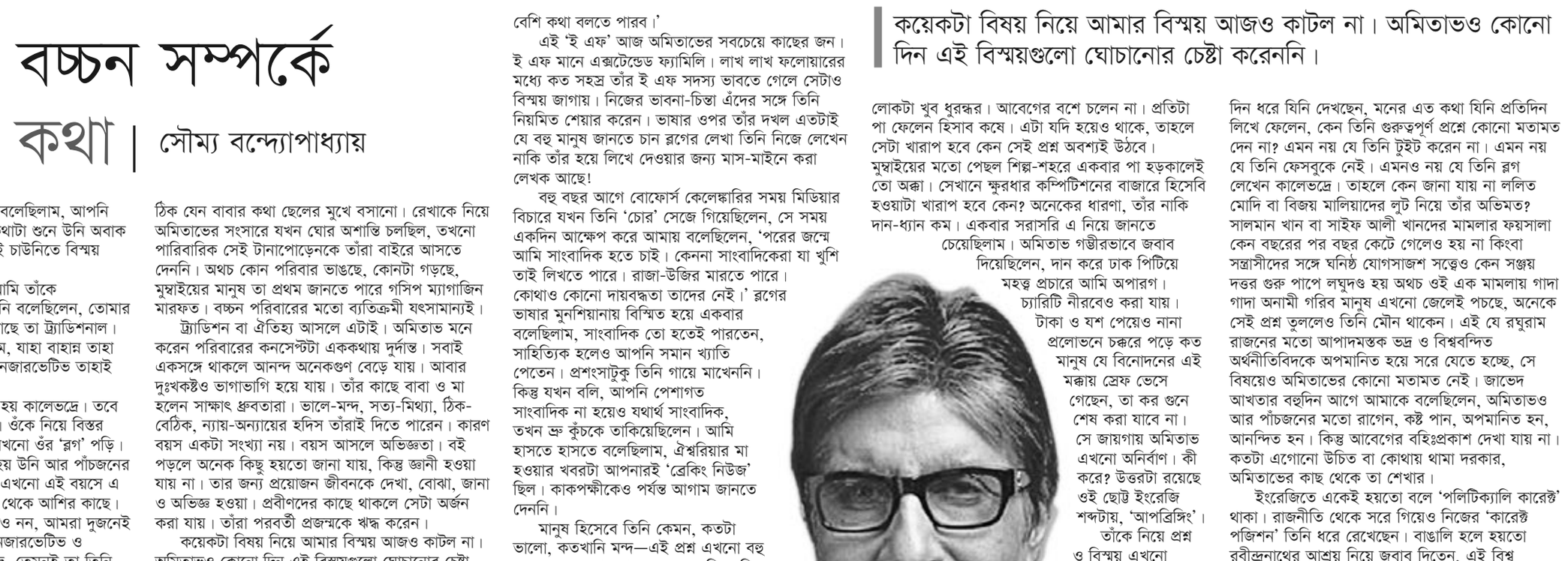

অমিতাভ বচ্চন
একজনই
ছবি : সংগৃহীত

ভূত শিকারি

রকিব হাসান

অলংকরণ : তুলি

আমার বন্ধু মানিক, ভূত নিয়ে গবেষণা করে। ভূতে বিশ্বাস করে। আমি করি না। একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করি দুজনে। এক ছুটির দিনে সে প্রস্তাব দিল, 'চল, সোনারগাঁ ঘুরে আসি। অনেক পুরোনো বিল্ডিং আছে ওদিকে। ভূতটুত পাওয়া গেলেও যেতে পারে।'

আমার ইচ্ছে নেই। মানিকের চাপাচাপিতে দুপুরের খাওয়া সেরে মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। বেরোনোর সময়ই লক্ষ করেছি, আকাশের অবস্থা ভালো না। মানিক তো মহাখুশি। 'বৃষ্টি আসবে। ভালোই। দুর্যোগের মধ্যেই ভূতেরা বেরোয় বেশি।'

সোনারগাঁয়ে পৌঁছানোর আগে তুমুল ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো। শ খানেক গজ দূরে একটা পুরোনো লাল ইটের তিনতলা বিল্ডিং দেখিয়ে মানিক বলল, 'ওখানে গিয়ে দেখি, বৃষ্টি থেকে বাঁচার উপায় করা যায় কি না।'

বাড়ির সামনে মোটরসাইকেল রেখে বারান্দায় উঠলাম। অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করার পর দরজা খুলে দিল এক বৃদ্ধ। বয়সের ভারে কুঁজো। হাতে একটা হারিকেন। বৃষ্টির দিনের সন্ধ্যা। অসময়েই অন্ধকার হয়ে গেছে।

বললাম, বিপদে পড়েছি। আমাদের ভালোমতো দেখল বুড়ো। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভেতরে ঢুকতে দিল।

ঝড় বাড়ছে। যা অবস্থা, তাতে রাতে আর থামবে বলে মনে হলো না। মানিকের প্রশ্নের জবাবে বুড়ো জানাল, সে এ বাড়ির কেয়ারটেকার।

আমাদের দোতলায় নিয়ে গেল বুড়ো। একটা ঘর দেখিয়ে দিল, 'নিন, জামাকাপড় ছাড়ুন। রাতে আর খাবার দিতে পারব না।'

লাগবে না, 'মানিক বলল।' 'ব্যাগে বিস্কুট আছে। পানিও আছে। রাত কাটিয়ে দিতে পারব।'

যেতে যেতে, দ্বিধা করে, কী ভেবে ঘুরে দাঁড়াল বুড়ো। ইতস্তত করে বলল, 'একটা কথা...বৃষ্টি থামলেই চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এ বাড়িতে...'

'থামলেন কেন?' মানিক বলল। 'এ বাড়িতে কী?'

'ভূতের উপদ্রব আছে, 'বুড়ো জানাল। ভয়ে ভয়ে তাকাল বাথরুমটার দিকে। বলল, 'বাড়িটা এক ইংরেজ সাহেবের। ওই বাথরুমে মরে পড়েছিল। ইস্পাতের বাথটাবের কানায় বাড়ি খেয়ে। মাথায় বাড়িটা লেগেছিল। এরপর বাড়িটা কেনেন এক বাঙালি জমিদার, ব্রজমোহন চৌধুরী। জমিদার দেখলেন, বাড়ির বেশির ভাগ ফিটিংসই নষ্ট হয়ে গেছে। সংস্কারকাজ শুরু করলেন তিনি। সবকিছু শান্ত স্বাভাবিকই থাকল, যতক্ষণ না বাথরুমের মরচে পড়া ইস্পাতের বাথটাব সরানোর চেষ্টা করা হলো। কিছুতেই সরানো গেল না টাবটা। কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন বিপুল শক্তিতে আটকে রাখল ওটাকে। সেদিন থেকে আরও একটা ঘটনা ঘটতে লাগল, একজন বৃদ্ধ মানুষের ভূত দেখা দিতে শুরু করল বাড়িটায়। ভূতের প্রথম শিকার ব্রজমোহনের বড় মেয়ে চৌদ্দ বছরের কনিকা। ঘুমের মধ্যে তার গলা টিপে ধরল ভূতে। চেঁচামেচি শুরু করলে ভূতটা তাকে ছেড়ে দিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল। পরদিন আক্রান্ত হলো কনিকার চার বছরের বোন মনিকা। এরপর প্রায় প্রতিদিনই নানা রকম ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে লাগল বাড়িটাতে।

সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকে ব্রজমোহনের পরিবার। বিশেষ করে রাতের বেলা। ভূতের অত্যাচারে শেষে আর কোনো উপায় না দেখে একজন ওঝা ডেকে আনলেন ব্রজমোহন। কিছুই করতে পারল না ওঝা। হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। টিকতে না পেরে ব্রজমোহনও সপরিবারে বাড়ি ছাড়লেন। আমাকে রেখে গেলেন কেয়ারটেকার হিসেবে।'

'ভূতটা আপনাকে কিছু করে না?' উত্তেজিত হয়ে মানিক জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল কেয়ারটেকার। 'মাঝে মাঝে করে না তা নয়। কিন্তু কী করব? গরিব মানুষ। সংসারে কেউ নেই, একেবারেই একা। একটা নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছি। এখানেই নিচতলার একটা ঘরে পড়ে থাকি। এ ঘরে বিশেষ আসি না।'

চলে গেল বুড়ো। মানিক বলল, 'আমি আজ ওটাকে তাড়াবই।'

'কীভাবে তাড়াবি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'বুদ্ধি খরচ করে। যুক্তি দিয়ে বোঝাব ভূতটাকে।'

হেসে উঠলাম। আমার দিকে তাকাল মানিক। 'হাসো, হাসো, যত খুশি আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি মারো। তবে ভূতে বিশ্বাস আজ আমি তোকে করিয়েই ছাড়ব।'

আসবাবপত্র নেই ঘরে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে মেঝেতেই বসে রইলাম দুজনে। অনেক রাতে ঢুলতে শুরু করেছি, হঠাৎ আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে ফিসফিস করে মানিক বলল, 'এই রাজিব, ওঠ! ভূত!'

অবাক হয়ে দেখলাম ছায়ামূর্তিটাকে। মুখটা কাগজের মতো সাদা। অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে। তবে চেহারা চেনা যাচ্ছে না।

ভূতটাকে জিজ্ঞেস করল মানিক, 'আপনি কে? এ বাড়িতে কী করেন?'

আশ্চর্য! কথা বলে উঠল ভূতটা। বলল, 'কই, আমি তো জানি না আমি ভূত হয়ে গেছি। আমি তো আমার বাড়িতেই আছি।'

'আপনি যে মারা গেছেন, সেটা জানেন?'

'না। তবে একটা অশান্তি, অতৃপ্তি...ঠিক বুঝতে পারি না।'

'তার মানে আপনার অশান্ত আত্মা অতৃপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বাড়িতে।'

'আমি মুক্তি পাব কী করে?'

'পাবেন না, যতক্ষণ না এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।'

'জানালা দিয়ে উড়ে যান...কিংবা...কিংবা...বাথরুমের বাথটাবে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। যেটাতে বাড়ি খেয়ে আপনি মারা গেছেন। শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকুন...যাচ্ছি...যাচ্ছি...যাচ্ছি...'

> আশ্চর্য! কথা বলে উঠল ভূতটা। বলল, 'কই, আমি তো জানি না আমি ভূত হয়ে গেছি। আমি তো আমার বাড়িতেই আছি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভূতটা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন...'

টলতে টলতে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল ভূতটা।

হাসতে হাসতে মানিক বলল আমাকে, 'কী রাজিব মিয়া, কী খেলটা দেখালাম। এখন তো বিশ্বাস করছিস, ভূত আছে?'

'না।' জবাব দিলাম।

ঠিক এই সময় বুটের শব্দ তুলে ঘরে ঢুকল চার-পাঁচজন লোক। একজনের হাতে উজ্জ্বল টর্চ জ্বলে উঠল। অবাক হয়ে দেখলাম, ওরা পুলিশের লোক।

একজন অফিসার পিস্তল উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আপনারা? এখানে কী করছেন?'

পরিচয় দিয়ে জানালাম, বৃষ্টিতে আটকা পড়েছি।

'লোকটা কোথায়? কেয়ারটেকার?' অফিসার জিজ্ঞেস করলেন।

'নিচেই হয়তো আছে, তার ঘরে,' মানিক জবাব দিল।

'না, নেই। নিচতলার কোনো ঘরেই নেই। দরজার বাইরে থেকে শুনলাম, কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন?' ধমকে উঠলেন অফিসার, 'জলদি বলুন, লোকটা কোথায়?'

লোক নয়, ভূত, 'হাসিমুখে মানিক বলল। তাড়িয়ে দিয়েছি। ওই বাথরুমে।'

বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধাক্কা দিয়ে কবজা ভেঙে ভেতরে ঢুকল পুলিশ। টানতে টানতে বের করে আনল ভূতটাকে। হাতকড়া পরিয়ে দিল। হেসে বললেন অফিসার, 'কত দিন আর পালিয়ে থাকবে, বালতি? হেহ্ হেহ্ বাবা, আমি ইন্সপেক্টর জলিল শিকদার। আমার চোখে ধুলো দেওয়া এত সহজ না।' টান দিয়ে ভূতটার মুখের রবারের মুখোশ খুলে ফেললেন তিনি। বেরিয়ে এল একজন যুবকের মুখ।

আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন অফিসার, 'এই ব্যাটার নাম বালতি খোকন। এক মহিলাকে খুন করে ঘরের সব টাকাপয়সা, অলংকার লুট করে এখানে এসে কেয়ারটেকারের ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে। কেউ এদিকে এলেই বানিয়ে বানিয়ে ভূতের গল্প শোনায়। এভাবে গুজব ছড়িয়ে মানুষকে দূরে রাখার চেষ্টা করে, যাতে নিজে নিরাপদে থাকতে পারে।' সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটাকে গাড়িতে তোলো।'

'তার মানে আমাদেরও মিথ্যা ভূতের গল্প শুনিয়েছে?' হতাশ কণ্ঠে বলল মানিক।

তা ছাড়া আর কি, যদি আপনারা তার দোসর হয়ে না থাকেন, শীতল কণ্ঠে বললেন ইন্সপেক্টর। আপনাদেরও থানায় যেতে হবে। জিজ্ঞাসাবাদের পর যদি বুঝি নিরপরাধ, ছেড়ে দেওয়া হবে।

করুণ চোখে আমার দিকে তাকাল মানিক। 'রাজিব!'

ঝাঁজিয়ে উঠলাম। 'এখন আর রাজিব রাজিব করে কী হবে! কতভাবে বোঝালাম, ভূত বলে কিছু নেই। শুনলে না। করো এখন ভূত শিকার!'

ভ্রমণ

চে গুয়েভারার সেই বাড়িটি

ইকবাল হাসান

চে গুয়েভারা

জানুয়ারির রৌদ্রস্নাত সকালে হাভানার পার্ক সেন্ট্রাল হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, চে গুয়েভারার বাড়িতে যাব। শুনে ভাঙা ইংরেজিতে আমাকে যা বোঝাতে চাইলেন কিংবা আমি যতটুকু বুঝলাম তা হলো, ওখানে যেতে হলে টানেল দিয়ে যেতে হবে। আমি রাজি আছি কি না। আলবত রাজি, জানতে চাইলাম, কেন কোনো অসুবিধা আছে? ট্যাক্সিওয়ালা বললেন, মাঝে মাঝে ওই টানেল বন্ধ থাকে। আমরা বাঙালি, তার ওপর বাড়ি বরিশাল, দমবার পাত্র নই মোটে, বললাম, যাব। চব্বিশ কিলোমিটার পথ, যেতে তেত্রিশ মিনিট। কিছুদূর এসেই টানেল, নদীর তলদেশে। ভিড়বাট্টা নেই। টানেলের ভেতর আলোর স্বল্পতা চোখে পড়ার মতো। মাথার ওপর নদীর স্রোত, একটু গা ছমছম ভাব হয় যাবার পথে।

যার পায়ে এখনো মফস্বলের কাদা লেগে আছে, ভাবতেই পারি না সেই আমি, অবশেষে দাঁড়িয়ে আছি চে গুয়েভারার বাড়ির সামনে। স্বপ্নের একটি দৃশ্যচিত্র যেন, দেয়ালে লাল হলুদের খেলা ও সোনালি আলোয় ভরা দিন আর উপকূলীয় বাতাস 'চে' নামের বাড়িটিকে বড় আপন করে তুলেছে। আকাশে মেঘ নেই বলে আলো এখানে প্রভূত বিস্তৃত, ফলে বাড়িটির প্রবেশমুখে লাল হরফে 'চে' লেখাটি দীপ্র হয়ে দেখাচ্ছে যেন আকাশ ছোঁয়ার স্পর্ধা। আর অনতিদূরে কংক্রিটে নির্মিত সেন্ট চার্লসের বিশাল ভাস্কর্য। কেতাব হাতে তাকিয়ে আছেন সমুদ্রের দিকে। তাঁর পোশাক ধবধবে সাদা।

চে নামের বাড়ি

চে নামের বাড়িটিও একেবারে সাদামাটা, কোনো আদিখ্যেতা নেই, ছিমছাম, একতলা। খোলা ছাদ, যেখান থেকে দেখা যায় অবারিত আকাশ আর অনতিদূরের হাভানা; শোনা যায় সমুদ্রের গর্জন। একতলার ছাদে একটি চিলেকোঠা আছে। কেয়ারটেকার মহিলাদের একজন জানালেন, 'ওখানে কেউ থাকে না। নিয়ম নেই।' সর্বসাকল্যে পাঁচ-ছয়টি কক্ষ মাত্র, সযত্নে সাজানো। ছোট ছোট। চে-এর দৈনন্দিন ব্যবহৃত তৈজসপত্র, পাইপ, কফি বানানোর ছোট্ট পট সাজানো দুটো শোকেসে। যে কক্ষটিকে শোবার ঘর বলে শনাক্ত করা যায় সেখানে একটি খাট, ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা। আছে খাবার প্লেট, রেডিও ও একটি টাইপরাইটার। কিউবান পতাকা, টেবিল চেয়ার আর কালো রঙের ফোন নিয়ে ছোট্ট অফিস কক্ষ, এই বাড়িতে থাকাকালে কমরেড চে এখানে বসেই অফিস করতেন। এই কক্ষটির দেয়ালে রাষ্ট্রনায়ক ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে আলাপরত চে-এর সাদাকালো একটি ছবি। রোগের কাছে পরাভূত হওয়ার মতো মানুষ ছিলেন না তিনি। মধ্যরাত পর্যন্ত অফিস করতেন, পাশের কক্ষটি অপেক্ষাকৃত বড় আকারের, চে এই কক্ষে নিয়মিত সভা করতেন সহযোদ্ধাদের নিয়ে। কক্ষটিতে জনা পঞ্চাশেক লোক বসতে পারে। চেয়ারগুলো এখনো ওইভাবে সাজানো রয়েছে। দেখে মনে হলো, এই মাত্র সভা করে চলে গেছেন প্রিয় কমরেড।

২.

রাজধানী হাভানার হাতের নাগালের ভেতরেই লা কাবানায় [আসল নাম : ফোর্ট অব সেন্ট চার্লস] সমুদ্র উপকূলীয় টারারা নামের ক্ষুদ্র শহরে এই বাড়িটি।

স্বৈরশাসক জেনারেল বাতিস্তার আমলে অভিজাতদের দখলে ছিল পুরো এলাকা, তখন এই বাড়িটিতে থাকতেন কাস্টমসের এক কর্মকর্তা।

১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে ইতিহাসের মহানায়ক ফিদেল কাস্ত্রো ও চে গুয়েভারার নেতৃত্বে কিউবান বিপ্লবীরা লা কাবানা দখল করে নেয় কোনো ধরনের প্রতিরোধ ছাড়াই বাতিস্তার সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে, পালিয়ে যায় তার অভিজাতরাও।

চে গুয়েভারা বিপ্লবোত্তর কিউবার প্রতিরক্ষা প্রধান হিসেবে ১৯৫৯ সালের ২ জানুয়ারি থেকে ১২ জুন লা কাবানায় ছিলেন। এখানে বসেই তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও দণ্ড কার্যকর-প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করতেন। 'চে' নামের বাড়িটিতে তিনি মাস দুয়েক ছিলেন। বাড়িটি তাঁর স্ত্রী আলিদা মার্চের পছন্দ না হলেও পরবর্তী সময়ে হানিমুন করার জন্য এই বাড়িটিকেই বেছে নিয়েছিলেন তিনি। আরও কয়েকবার এসেছিলেন এই বাড়িতে। তখন অবশ্য বাড়িটির নাম 'চে' ছিল না। পরবর্তী সময়ে চে নিহত হওয়ার পর বাড়িটিকে জাদুঘরের আবহ দেওয়া হয়। বাড়িটির নাম রাখা হয় 'চে'।

বিপ্লবের শেষ দিকে বনজঙ্গলের ভেতর তিনি অ্যাজমায় আক্রান্ত হলে মুক্ত বাতাস ও সমুদ্র-সান্নিধ্য জরুরি হয়ে ওঠে তাঁর জন্য। কেয়ারটেকার মহিলা বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বললেন, প্রেমিকা এবং পরবর্তী সময়ে স্ত্রী আলিদা মার্চকে নিয়ে সমুদ্র উপকূলীয় এই বাড়িটিতে উঠে আসেন তিনি। স্বয়ং কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো নাকি তাঁকে আপাতত এই বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন তথ্যচিত্রে দেখা যায় যে, অসুস্থ চেকে দেখার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান ফিদেল কাস্ত্রো এই বাড়িতে এসেছেন বহুবার। অ্যাজমা তখন প্রায় কাবু করে ফেলেছিল কমরেড চেকে। টানা দুমাস এই বাড়িতে কাটানোর পর এখানকার মাইক্রোক্লাইমেট, বিশেষ করে পরিশুদ্ধ বাতাস আর বিশুদ্ধ জল এবং প্রেমিকা নার্স আলিদা মার্চের সার্বক্ষণিক পরিসেবায় তিনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে ওঠেন। বিপ্লবের সহযোদ্ধা আলিদা মার্চকে বিয়ে করেন ১৯৬০ সালে এবং এ সংসারে তাঁদের রয়েছে চার সন্তান। ১৯২৮ সালের ১৪ জুন বিশ্বের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহান বিপ্লবী চে গুয়েভারার জন্মদিন। জন্মস্থান আর্জেন্টিনার রোজারিও। বাবা আর্জেন্টাইন-আইরিশ। পেশায় স্থপতি। চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষা শেষে দুই বছর চে গুয়েভারা দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে বেড়ান এবং একপর্যায়ে মেক্সিকোতে কিউবা বিপ্লবের মহানায়ক ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁর। তাঁরা পরিকল্পনা করেন মার্কিনদের পদলেহনকারী, চরম দুর্নীতিবাজ একনায়ক জেনারেল বাতিস্তাকে উৎখাত করে শোষিত-চিরবঞ্চিত জনগণের হাতে রাষ্ট্রের মালিকানা তুলে দেওয়ার। এই সময় তাঁকে চে নামটি দেওয়া হয়, যার অর্থ সবার বন্ধু। বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত শোষিত মানুষের অধিকার আদায় আর সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মোৎসর্গকারী এই মহাপুরুষ আজ শুধু কিউবায় নয়, যেন সারা পৃথিবীর মানবমুক্তির প্রতীক, সবার বন্ধু।

> তখন অবশ্য বাড়িটির নাম 'চে' ছিল না। পরবর্তী সময়ে চে নিহত হওয়ার পর বাড়িটিকে জাদুঘরের আবহ দেওয়া হয়। বাড়িটির নাম রাখা হয় 'চে'

আর 'চে' নামের ওই বাড়িটি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মনে হলো, যেন বাড়িটি স্যুররিয়াল, বাস্তব-অবাস্তবের মাঝামাঝি এক টুকরো মেঘের মতোন ভাসমান জীবন্ত মন্দির, যেন একটি দীর্ঘশ্বাস। আর ভেতরের সবকিছু দেখে আমার ভাবতে অবাক লাগে, বিস্মিত হই এই ভেবে যে এত সামান্য কিছু দিয়েও একজন বিশ্বখ্যাত বিপ্লবীর চলে, যার রাষ্ট্রব্যবস্থা পাল্টে দেওয়ার দর্শন ছাড়া অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই তেমন।

শুধু ফেরার সময় আমার এই পোড়া কপালে তিন আঙুল ঠেকিয়ে মনে মনে বললাম, রেড স্যালুট টু ইউ কমরেড।

চে গুয়েভারার প্রতিকৃতির সামনে লেখক

কিউবার রাজধানী হাভানার কাছেই চে নামের সেই বাড়ি

গল্প

শাহাদুজ্জামান

মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান খুব পরিষ্কার

মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান খুব পরিষ্কার, আমি এর ঘোর বিরোধী।

এই যে মানুষটা নানা নল, টিউব ইত্যাদি লতাগুল্মের ভেতর জড়িয়ে অচেতন হয়ে আইসিইউর বিছানায় শুয়ে আছে, সে আমার বাবা। আমার বাবা সেই মানুষ, যার একই দিনে দুইবার পকেটমার হয়েছিল। আমি নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে ঢাকা আমার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

গত সপ্তাহে বাবার যখন জ্ঞান ছিল, আমাকে বলছিল, 'পলাশ, দ্যাখ, বুড়া হতে হতে আমার হাতের চামড়াগুলি কেমন বেগুনপোড়ার মতো হয়ে গেল।' আমি বাবার বেগুনপোড়ার মতো হাতের চামড়ায় হাত বুলিয়েছিলাম।

আমি বাবার কানের কাছে গিয়ে বলি, 'বাবা, আমি পলাশ, শুনতে পাচ্ছ?'

বাবার নাকে-মুখে জটিল সব যন্ত্র। তার চোখ বোজা। ওসবের ভেতরই বাবা মৃদুভাবে মাথা নাড়ায়। হ্যাঁ, আমার কণ্ঠস্বর বাবা শুনতে পাচ্ছে।

আমি ফিরে আসি ডাক্তারের চেম্বারে। 'তার মানে, বাবার সেন্স আছে?' আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করি।

ডাক্তার বলেন, 'হ্যাঁ, উনার ব্রেইন সচল আছে। উনার সব অঙ্গ আমরা মেশিন দিয়ে চালু করে রেখেছি। উনি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছেন।'

কয়েক মাস ধরে দেখতাম, বাবা আমার পাঁচ বছরের ছেলে শায়ানের সঙ্গে একত্রে বসে শুধু নানা রকম কার্টুন ছবি দেখে। কার্টুন দেখতে দেখতে বাবা আর শায়ান দুজনে মিলে বিপুল হাসিতে গড়াগড়ি যায়।

র‍্যালি ব্রাদার্সের কুঠিগুলোতে হাইড্রলিক মেশিনে পাটের পাকা গাঁট বাঁধা হয়ে কী করে সরিষাবাড়ী থেকে ব্রিটেনের ডান্ডি শহরে চলে যেত, সে গল্প বাবা আমাকে করেছে। বাংলার সোনালি আঁশ তখন ভ্রমণ করছে পৃথিবীর দূর-দূরান্তে। বাবার বর্ণনায় আমি দেখতে পেতাম, সরিষাবাড়ীর প্রতিটি বাড়িতে রাখা পাট শুকানোর বাঁশের আড়া আর দাঁড় করানো ঝুঁটি-বাঁধা পাটশোলার সারি। বাবা চরের মানুষ। সমতলের মানুষ তাদের ডাকে 'চইরা'। বাবার তাতেই গর্ব। কারণ, অবাধ পানির প্রাচুর্যে চর অঞ্চলের পাট সবচেয়ে সরেস। বাবা বর্ণনা করত, মোরগ-ডাকা ভোরে বাড়ির কামলারা কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ দিয়ে পান্তাভাত খেয়ে পানিতে নামত পাট ধুতে, আর পানি থেকে উঠত মাগরিবের আজানের পর। বাবা অভিনয় করে কামলাদের পাট ধোয়ার নিপুণ ভঙ্গি আর কসরত দেখাত আমাকে। এক পাটগাছের কত রকম ব্যবহার, তার বর্ণনা করত বাবা। পাটের কচি পাতা খাওয়া হতো নাইল্যা শাক হিসেবে, শুকনা পাটপাতা হতো রোগীর ওষুধ, গোড়ার পাটশোলা হতো জ্বালানি, আগার পাটশোলা ঘরের বেড়া আর সোনালি আঁশের পাট সরিষাবাড়ী থেকে চলে যেত দূর স্কটল্যান্ডের শহরে। এমনভাবে পাটের বর্ণনা দিত বাবা, যেন কোনো স্বর্ণকেশী রূপকথার রাজকন্যার বর্ণনা দিচ্ছে। সরিষাবাড়ীর পাটের রূপ বাবাকে ঘোরগ্রস্ত করে রেখেছিল আজীবন।

ওই সরিষাবাড়ীর কাছেই জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে ফেরিতে ওঠার সময় একবার এবং নামার সময় আরেকবার বাবার পকেটমার হয়েছিল।

আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করি, 'বাবার অবস্থা কি রিভার্সিবল?'

'উনার ক্যানসার এখন ফোর্থ স্টেজে। উনার যে বয়স, তাতে এ অবস্থা থেকে ফিরে আসবার সম্ভাবনা খুব কম।'

পাটের মৌসুমে হাটের আগের দিন অনেক রাত জেগে পাটের গোছগাছ চলত ছোট-বড় সব গৃহস্থ আর কৃষকদের বাড়িতে। পরদিন সকালে হিড়িক পড়ত খাল, নদী থেকে ডুবিয়ে রাখা নৌকা তোলার। যাদের নৌকা নেই, তারা নৌকাওয়ালাদের নৌকা তুলে লগি, বৈঠা, দড়ি-কাছি বাদাম নৌকায় তুলে বাইতে সাহায্য করত। সকালে কড়কড়া ভাত চুলার পাশে রেখে তাতানো শুকনা মরিচ মেখে টকটকা লাল করা হতো। সেই রক্তিম তীব্র ঝাল ভাত খেয়ে গ্রামের কয়েক শরিকের নৌকা একসঙ্গে রওনা হতো হাটের উদ্দেশ্যে। নৌকা হালট, খাল, বিল পার হয়ে পড়ত যমুনা নদীতে। নদীতে পড়ার ঠিক সেই মুহূর্তে নৌকার সবাই একসঙ্গে বলে উঠত, 'আল্লা আল্লা রসুল বলো, আল্লা আল্লা রসুল।' নদীতে পাল-তোলা নৌকার বহরে একটা অলিখিত প্রতিযোগিতা চলত। গৃহস্থরা তাদের ব্যাপারী নৌকায় পাট বোঝাই করে সরাসরি দিত কুঠিতে। মাপামাপি চলত সেই পাটের। মাপত কয়ালেরা। তারা মন্ত্রের মতো মাপতে মাপতে বলত, লাবে লাব, লাবে দুই, লাবে তিন, লাবে চার...। একেক পাটের একেক দাম—তোষা, বটম, ক্রস বটম। পাট বিক্রি শেষে শুরু হতো হাটবাজার। চলত বিস্তর সদাইপাতি। নিত্য দরকারি জিনিসের সঙ্গে বাচ্চাদের বাঁশের খেলনা, ছেলেদের গেঞ্জি-লুঙ্গি আর মেয়েদের শাড়ি, ডাপটা, চুড়ি, আলতা। আর সবার সদাইয়ের ঝাঁকায় একটা অনিবার্য আইটেম—লোনা ইলিশ, লবণ-মাখানো শুকনা ইলিশ। সবার বাজার শেষে একসঙ্গে ঘাট ছাড়ত নৌকা। বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত। ঘরে অপেক্ষমাণ মেয়েরা, বাচ্চারা। হাট থেকে ফিরতে যত রাতই হোক, সাদা হয়ে যাওয়া পোক্তো চালকুমড়া ব্যাপক ঝাল দিয়ে লোনা ইলিশ রান্না করা হতো। তারপর হারিকেনের আলোয় সবাই মিলে কলরব করতে করতে নিশুতি রাতে ঝাল ঝোলে রান্না নোনা ইলিশের তরকারি দিয়ে ভাত খাওয়া হতো। বাবা এসব এমনভাবে বর্ণনা করত, যেন কোনো থিয়েটারের বিবরণ দিচ্ছে।

আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করি, 'বাবার কি কষ্ট হচ্ছে?'

সাদা অ্যাপ্রোন পরা নির্বিকার ডাক্তার বলেন, 'হ্যাঁ, হচ্ছে।'

'এই যে ভেন্টিলেটর, টিউব—এগুলোতে কষ্ট হচ্ছে?'

গম্ভীর ডাক্তার, 'হ্যাঁ, হচ্ছে।'

'তাহলে এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে কী লাভ?'

'এসব যন্ত্রপাতি তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এসব মেশিন উইথড্র করলে উনি মারা যেতে পারেন।'

আমি বলি, 'আমি আমার নাম বললে বাবা মাথা নাড়ে। আমি কি এভাবে যতবার আমার নাম বলব বাবা ততবার মাথা নাড়বেন?'

ডাক্তার তাঁর স্টেথো গলা থেকে নামিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, তা নাড়বেন।'

ছোটবেলায় একবার গ্রামের বাড়ি গেলে সেই যমুনা নদীতে বাবা আমাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল, আমাকে সাঁতার শেখাবার জন্য। আমি পানিতে পড়ে হাঁসফাঁস করছিলাম,

সচিত্রকরণ : আনিসুজ্জামান সোহেল

আমার তীব্র শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আর বাবা তীরে দাঁড়িয়ে হাসছিল। বাবাকে খুব নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল আমার। আমি যখন প্রায় ডুবতে বসেছিলাম, তখন বাবা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আমাকে কোলে তুলে এনেছিল। বাবার কি এখন ঠিক তেমন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, যেমন আমার হয়েছিল যমুনার পানিতে? আমি কি ঝাঁপ দিয়ে এখন বাবাকে তুলে আনতে পারি তীরে?

গত সপ্তাহে যখন কথা হচ্ছিল, বাবা আমাকে আরও বলেছিল, 'তোর মা আগে মরে গিয়ে ভালোই হয়েছে। না হলে তার হাতের চামড়াও আমার মতো এমন বেগুনপোড়ার মতো হতো।'

বাবা আমাকে গ্রিক দেবী ইয়োসের গল্প বলেছিল। ইয়োস ভোরের দেবী। তার আঙুলগুলো গোলাপি। ইয়োস প্রেমে পড়েছিল মানুষ টিথোনাসের। কিন্তু ইয়োস তো দেবী। তিনি অমর। অথচ মানুষ টিথোনাসের মৃত্যু ঘটবে একদিন। তার প্রেমিক একদিন মারা যাবে, এ সত্য কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না ইয়োস। ভোরের দেবী ইয়োস দেবতা জিউসের কাছে প্রার্থনা করলেন, টিথোনাসও যেন অমরত্ব লাভ করে। জিউস ইয়োসের ইচ্ছা পূরণ করলেন। টিথোনাসকে অমরত্বের বর দিলেন তিনি। আনন্দে, উচ্ছ্বাসে, প্রেমে দিন কাটে ইয়োস আর টিথোনাসের। বছরের পর বছর কাটে। তারপর হঠাৎ একসময় ইয়োস লক্ষ করে টিথোনাসের বয়স বাড়ছে। টিথোনাস ক্রমশ প্রৌঢ় থেকে বৃদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু ইয়োস তো অনন্ত যৌবনবতী। ইয়োসের বোধোদয় হয়। সে টের পায় যে ভুল হয়ে গেছে। জিউসের কাছে টিথোনাসের অমরত্বের বর চাইলেও চিরযৌবনের বর তো সে চায়নি। জিউসের কাছে আর চাইবার তো উপায় নেই। ফলে চিরযৌবনা ইয়োসের চোখের সামনে টিথোনাস একটু একটু বার্ধক্যে নুয়ে পড়তে থাকে। টিথোনোস মরে না, কিন্তু থুত্থুড়ে বুড়ো হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে তার আর কথা বলবার শক্তি থাকে না, চলার কোনো শক্তি থাকে না। একটা বিছানায় স্থির হয়ে শুয়ে থাকে টিথোনাস। আর শুধু নিজের মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু মৃত্যু হয় না তার। ইয়োস মনে গভীর দুঃখ নিয়ে অমর টিথোনাসের দিকে তাকিয়ে চোখের পানি ফেলে। অমরত্বকে তখন তার মনে হয় অভিশাপ।

বাবা বলে, 'তোর মা-ও আমার প্রেমে পড়েছিল। ইয়োসের মতোই তোর মায়ের আঙুলগুলো ছিল গোলাপি। সে আগে মরে ভালোই হয়েছে। সে ইয়োসই থেকে গেল। আমার এই টিথোনাসের রূপ তাকে দেখতে হলো না।'

আমি ডাক্তারকে আবার জিজ্ঞাসা করি, 'বাবা কি আর ফিরবে?'

ডাক্তার নির্বিকার বলেন, 'সে সম্ভাবনা কম।'

'তাহলে এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে কী লাভ?'

'তার লাইফটা আরেকটু প্রোলংগড হলো।'

'তাতে কি উনি ফিরবেন?'

'সেটা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে তিনি বেঁচে থাকবেন।'

আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, 'আমি কানের কাছে গিয়ে যখন বলব, আমি পলাশ, উনি তখন মাথা নাড়বেন?'

ডাক্তার আবার বলেন, 'হ্যাঁ, তা নাড়বেন।'

'কিন্তু আর কখনো উঠে দাঁড়াবেন না।'

ডাক্তার সামনের কাগজে সই করতে করতে বলেন, 'সে সম্ভাবনা খুব কম।'

'তাহলে এই যন্ত্রপাতি দিয়ে কী লাভ হবে?'

ডাক্তার বিরক্ত না হয়ে পুনরাবৃত্তি করেন, 'তিনি আরও কিছুদিন বাঁচলেন।'

'ওই বিছানায়, ওই যন্ত্রপাতি নিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'এসব যন্ত্রপাতি নাকে-মুখে দেওয়া থাকলে তো তিনি কষ্ট পাবেন।'

'হ্যাঁ, তা পাবেন।'

আমি ঘোরানো সিঁড়ির মতো প্রশ্ন করে চলি, 'তবু তিনি বেঁচে থাকবেন?'

'হ্যাঁ, তা থাকবেন।'

'তাতে কী লাভ?'

ডাক্তার কোনো উত্তেজনা না দেখিয়ে বলেন, 'লাভ মানে মেডিকেল সায়েন্স আপনাকে একটা অপশন দিচ্ছে তার লাইফ প্রোলংগড করার। আপনি চাইলে সেই অপশন নিতে পারেন, না-ও নিতে পারেন। না নিতে চাইলে আমরা লাইফ সাপোর্ট খুলে নেব।'

'তখন উনি মারা যাবেন?'

'হ্যাঁ, সে সম্ভাবনাই বেশি। আবার সারভাইভও করে যেতে পারেন।'

বাবা আমাকে গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী গান শুনিয়েছিল :

চল কোদাল চালাই
ভুলে মনের বালাই
ঝেড়ে অলস মেজাজ
হবে শরীর ঝালাই
যত ব্যাধির বালাই
বলবে পালাই পালাই
পেটে ক্ষুধার জ্বালায়
খাব ক্ষীরের মালাই
বাবা আমাকে বলেছিল :
উত্তর দুয়ারি বাড়ি,
দীঘল ঘোমটা নারী,
পানার তলের শীতল জল,
তিনই মন্দকারী।

বাবা মদনমোহন তর্কালংকারের k÷kÞর কথা তার বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মনে রেখেছিল। বাবা আমাকে শোনাত, 'কর কর খর খর গর গর ঘর ঘর। ধর বচন কর রচন। কানাকে কানা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না, তাহা বলিলে তাহারা মনে দুঃখ পায়। উহ্, মেঘের ডাকে কান ফাটিয়া যায়।'

আমি ডাক্তারকে বলি, 'মেডিকেল সায়েন্স শুধু অপশন দিচ্ছে লাইফকে প্রোলংগড করার। মানে অন্যভাবে বললে, ডেথকে ডিলে করার, লাইফে ফিরিয়ে আনার না?'

'কেউ কেউ ফেরে, কিন্তু আপনার বাবার ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা কম।'

'উনি কত দিন এভাবে থাকতে পারেন?'

'সেটা বলা যাবে না। আজকেও অবস্থা ডেটেরিয়োরেট করতে পারে, আবার এক মাস সারভাইভও করতে পারে।'

বাবার এটা তৃতীয় দিন।

বাবা বলেছিল, সরিষাবাড়ী বাজারের হরিপ্রসাদ আগরওয়ালার পাটের গুদাম পরিষ্কার করে টকি বায়োস্কোপ চালানো

হয়েছিল। সেখানে বাবা nvŸi Iqwj ছবিটা দেখেছিল। নায়িকার নাম নাদিরা বেগম। আশপাশের গ্রাম ভেঙে লোক এসেছিল টকি দেখতে। গুদামের দরজা খোলা। ভেতরে-বাইরে লোক ঠাসাঠাসি। বিজলি বাতি দেখে সবাই তাজ্জব। ডায়নামোর ভটভট শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বিজলি বাতি জ্বলে ওঠে। আবার পর্দায় ছবি ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সব বাতি নিভে যায়। এক মহাকাণ্ড।

বাবা দেখল, একটা মেয়ে লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চাবুক ঘোরাচ্ছে। ঘোড়ায় করে কিছু দূর যেতেই দুম করে ফিল্মের ফিতা ছিঁড়ে গেল। ডায়নামা বন্ধ হয়ে গেল। চারদিক অন্ধকার, কিন্তু হলে পিনপতন নিস্তব্ধতা। কখন আবার বাতি জ্বলে উঠবে, পর্দায় ছবি ভাসবে—সে জন্য সবার অধীর অপেক্ষা। প্রজেক্টরম্যান ব্রজবাবু হাঁকডাক দিয়ে ছেঁড়া ফিল্ম জোড়া লাগানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। সবাই ব্রজবাবুর প্রতিটা নড়াচড়া বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছে। ব্রজবাবু যেন দেবদূত।

আমি ডাক্তারকে বললাম, 'প্রতিদিন আইসিইউর খরচ চল্লিশ হাজার টাকা।'

'হ্যাঁ।'

'প্রতিদিন এই পরিমাণ টাকা দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব।'

'সে সিদ্ধান্ত আপনারা নেবেন। আপনারা বললে আমরা লাইফ সাপোর্ট খুলে নেব।'

'কিন্তু মেডিকেল সায়েন্স তো বাবার লাইফকে প্রলংগড করার একটা অপশন দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'এই অপশনটা সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা আমার নৈতিক দায়িত্ব, তাই তো?'

'সেটা আপনার ব্যাপার।'

'যদিও আমি এ খরচ বহন করতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাব।'

'সেটা আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন।'

'এই অপশনটা না থাকলে তো আমাকে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো না। যদিও এই অপশন বাবাকে আবার সুস্থ করে ফিরিয়ে দেবে না।'

'সে সম্ভাবনা কম। তারপরও কিছু বলা যায় না।'

'হয়তো আরও দুই দিন, তিন দিন কিংবা দুই সপ্তাহ এই মেশিনের ভেতর থাকবে বাবা।'

'হয়তো তার চেয়েও বেশি, কিংবা তার চেয়ে কম।'

'একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন-মৃত্যুর সীমানায় বাবা এভাবে ঝুলতে থাকবে?'

'তা বলতে পারেন।'

'তারপরও এভাবে রেখে দিলে আমি জানব যে বাবা বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'যদিও বাবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।'

'হ্যাঁ, সেটা ঠিক।'

'তবু প্রতিদিন চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব, তাই তো?'

'সেটা আপনি বুঝবেন।'

'মেডিকেল সায়েন্স জীবন-মৃত্যুর কোনো সমাধান দিতে পারছে না, কিন্তু আমাদের একটা নৈতিক দ্বিধার ভেতর ফেলে দিচ্ছে। তাই নয় কি?'

'আপনি আমার অনেক সময় নিচ্ছেন। আমি ব্যস্ত আছি। আপনি বাইরে গিয়ে বসেন।'

বাবার হাতের চামড়াগুলো পোড়া বেগুনের মতো হয়ে গিয়েছিল। মায়ের চামড়াও পুড়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেগুলো বেগুনের মতো হয়েছিল কি না, সেটা দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি। মায়ের সারা শরীর ব্যান্ডেজে ঢাকা ছিল। ঘটনাটা আমি আমার চোখের নিচ থেকে কখনোই সরাতে পারি না, অবিরাম তা ফুটে থাকে। আমরা টেলিভিশন দেখছিলাম, তখন সাদা-কালোর যুগ। বাবা, মা আর আমি টেলিভিশনের সামনে বসে। পাশের ঘরে বোন পারুল মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। পারুলের ক্লাস ফাইভের বৃত্তি পরীক্ষা চলছে। টেলিভিশনে মাহমুদুন নবী গান গাইছিলেন, 'শিল্পী আমি তো নই, তবুও এসেছি আজ শোনাতে যে গান এই জলসায়...।'

বাবা বলল, 'শিল্পী না তো তুমি এসেছ কেন বাবা গান শোনাতে?' বলে হো হো করে হাসতে লাগল।

মা বলল, 'পলাশ, তোর বাবার সবকিছু নিয়েই ফাজলামি।' এ সময় হঠাৎ মা বলল, 'বেচারা পারুলটা সেই সন্ধ্যা থেকে পড়ছে। ওকে এক গ্লাস দুধ গরম করে দিয়ে আসি।'

বাবা বলল, 'যাও, যাও, বেচারা মেয়েটা পড়তে পড়তে কাহিল হয়ে গেল।'

আমি টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে গান শুনতে লাগলাম। মা তার খুব পরিচিত ভঙ্গিতে আঁচলটা টেনে হেঁটে গেল রান্নাঘরে। মাহমুদুন নবী গাইছেন, 'ক্ষমা করে দিও মোরে ভুল যদি হয়ে যায়...।' আর তখনই আমরা রান্নাঘর থেকে বিকট চিৎকারটা শুনতে পেলাম। বাবা আর আমি ছুটে গেলাম। মা গ্যাসের চুলা জ্বালাতে লাইটারটা অন করতেই দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। লেগে যায় মায়ের শাড়িতে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে মায়ের শাড়ি। পানি ঢেলে, কাপড় দিয়ে চেপে ধরে বাবা আগুন নেভায়। কিন্তু ততক্ষণে পুড়ে গেছে মায়ের সারা শরীর। নিস্তেজ হয়ে গেছে মা। হাসপাতালে নেওয়া হলো মাকে। মায়ের শরীরের প্রায় আশি ভাগ পুড়ে গিয়েছিল। আর কোনো কথা বলতে পারেনি মা। দশ দিন পর মা মরে গেল। টেলিভিশন দেখতে দেখতে, গান শুনতে শুনতে, ঠাট্টা করতে করতে, দুধ গরম করার মতো অকিঞ্চিৎকর একটা কাজ করতে করতে মরে গেল মা।

বাবা বলেছিল, তাদের সরিষাবাড়ী বাড়ির কাছারি প্রাঙ্গণে বিরাট বিরাট বকুল আর ঝাউগাছ ছিল। বাতাসে ঝাউগাছের শনশন শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যেত। সকালবেলায় শিশিরভেজা ঘাসের ওপর ঝরা বকুল দেখে মনে হতো কেউ যেন সাদা চাদর বিছিয়ে রেখেছে। কে কার আগে ঘুম থেকে উঠে বকুল ফুলের মালা গাঁথবে, এ নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যেত। বাবার শৈশবের খেলার সাথি গীতি, মীরা, বীণা অন্ধকার থাকতে বকুলতলায় গিয়ে ফুল কুড়াতে শুরু করত। আর বাবা, সাখাওয়াত, মতি, টুকু পরে যোগ দিত তাদের সঙ্গে। লম্বা লম্বা পরগাছা লতা দিয়ে একসঙ্গে মালা গাঁথত। তারা যখন মালা গাঁথছে, উঁচু গাছ থেকে বকুল ফুলগুলো উল্টানো খোলা ছাতার মতো উড়ে উড়ে এসে বাবা আর তার বন্ধুদের মাথার ওপর পড়ত, যেন তুষারবৃষ্টি হচ্ছে।

গত সপ্তাহে আমি যখন বাবার বিছানায় বসে তার বেগুনপোড়া চামড়ায় হাত বোলাচ্ছি, বাবা বলেছিল, 'আমার কি মনে হয় জানিস? রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সবার কাছে ভিক্ষা চাই। বলি, আপনার জীবন থেকে পাঁচটা মিনিট আমাকে দিয়ে দেন। একজনের জীবন থেকে পাঁচ মিনিট দিয়ে দিলে তাদের তো কিছুই হবে না, কিন্তু এমন অনেকে যদি আমাকে পাঁচ মিনিট করে দেয়, আমি হয়তো আরও একটা বছরের আয়ু পেয়ে যেতে পারি। বেঁচে থাকা মানে তো মানুষকে ভালোবাসতে পারার একটা সুযোগ। হয়তো মানুষের ভালোবাসা পাওয়ারও একটা সুযোগ। মনভরা এত ভালোবাসা নিয়ে তোর মা তো সেই সুযোগ পেল না।'

ডাক্তার বলেন, 'আমরা আপনার বাবার ব্যাপারে একটা অ্যাটেম্পট নিয়ে দেখতে চাই। আমরা ট্রায়াল বেসিসে কিছু সময়ের জন্য তার ভেন্টিলেটর উইথড্র করে দেখতে চাই। আপনি কালকের মধ্যে আমাদের এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত জানাবেন।'

'উইথড্র করলে কী হবে?'

'উনি সারভাইভ করতে পারেন। আমরা দেখব, কতক্ষণ উনি নিজের শক্তিতে শ্বাস নিতে পারেন। আবার অনেক সময় ভেন্টিলেটর উইথড্র করলে পেশেন্ট ইমিডিয়েটলি মারাও যেতে পারে। সে রিস্কও আছে। আপনি কনসেন্ট দিলে আমরা একটা চেষ্টা করব।'

একটা চেনা সিঁড়ি দিয়ে উঠে পরিচিত দরজাটা পাওয়া গেল। চাবি দিয়ে পরিচিত দরজাটা খোলা গেল। তারপর দেখা গেল দরজার ওপাশে আর কোনো ঘর নেই, সিঁড়ি নেই, কিছু নেই। একটা গভীর খাদ। আর এক পা এগোলেই সেই খাদে পড়তে হবে। বাবা কি দরজার চাবি খুলে তেমন একটা খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে?

আমি অনুমতি নিয়ে সেদিনের মতো শেষ আরেকবার মাস্ক আর গাউন পরে আইসিইউতে বাবার কাছে যাই। বাবাকে বলি, 'আমি পলাশ, শুনতে পাচ্ছ?'

বাবা মাথা নেড়ে জানায়, 'হ্যাঁ, পাচ্ছে।'

আমি বাসায় ফিরে আসি। ঘরে ঢোকার পর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। আমি জানালায় গিয়ে দাঁড়াই। তুমুল বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে রাস্তা, মানুষ, গাড়ি। মনে হচ্ছে, আজকে একদিনেই আকাশ পৃথিবীর কাছে তার সবটুকু ঋণ শোধ করে দেবে।

বাবা টিউব ভেন্টিলেটারের লতাগুল্ম নিয়ে সিঁড়ির খাদে। আমি কাল বাবার কাছে গিয়ে আবার বলতে পারি, 'বাবা, আমি পলাশ, শুনতে পাচ্ছ?' বাবা আবার মাথা নেড়ে বলবে, 'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছে।' আমি জানব, বাবা বেঁচে আছে। এই দৃশ্যটুকু আমি মঞ্চস্থ করে যেতে পারি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। আমি আমার নাম বলব। বাবা তার মাথা নাড়বে। আমি জানব, বাবা বেঁচে আছে। বাবার বেঁচে থাকা মানে যদিও ওই মাথানাড়াটুকু। বাবার ওই মাথা নাড়ানোর মূল্য প্রতিদিন চল্লিশ হাজার টাকা। আমরা এই অর্থ জোগান দেওয়ার জন্য নিঃস্ব হয়ে যাব। কিন্তু বাবার জীবনের বিপরীতে টাকার এই হিসাব মর্মান্তিক, অমানবিক, স্বার্থপর। কিন্তু এই জটিল যন্ত্রপাতি কি বাবাকে টিথোনাসের মতো অমরত্ব দিতে পারবে? দিতে পারলেও বাবা কি সে সুযোগ গ্রহণ করতে চাইবে? আমি কালকে ডাক্তারকে বলতে পারি, 'হ্যাঁ, ভেন্টিলেটর খুলে দিন। দেখা যাক বাবা নিজের মতো শ্বাস নিতে পারে কি না।' ভেন্টিলেটর খুলে নেওয়ার পর বাবা বুকভরে শ্বাস নিতে পারে। আবার ভেন্টিলেটর খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাবা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে। আমাকে আগামীকাল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।

একদিন দেখি, বাবা আর আমার পাঁচ বছরের ছেলে শায়ান বসে ওয়াল্ট ডিজনির একটা কার্টুন ফিল্ম দেখছে। একটা হাঁসের ছানা ঝড়ে উড়ে গিয়ে এক গর্তে পড়েছে। আর উঠতে পারছে না। মা-হাঁস ঝড়বাদলে জঙ্গলের ভেতর আকুল হয়ে ছানাকে খুঁজছে। পাচ্ছে না। দেখি, শায়ানের চোখ বেয়ে পানি পড়ছে। দেখি, আমার বাবার চোখ বেয়েও পানি পড়ছে। এক হারিয়ে যাওয়া হাঁসের ছানার জন্য দাদা আর নাতি টেলিভিশনের পর্দার সামনে বসে অঝোরে কাঁদছে।

আবারও আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই, মৃত্যু সম্পর্কে আমার অবস্থান খুব পরিষ্কার, আমি এর ঘোর বিরোধী।

বিশ্বের এক শীর্ষ ধনীর সাফল্যের রহস্য

শওকত হোসেন

ওয়ারেন বাফেটের বাবা হাওয়ার্ড বাফেট ছিলেন শেয়ারবাজারের একজন বিনিয়োগকারী। ছোটবেলায় দেখতেন বাবা ওয়ালস্ট্রিট থেকে একগাদা কাগজপত্র নিয়ে রাতে বাসায় ফিরছেন। একদিন মাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বাবা আসলে কী করেন? মায়ের উত্তর ছিল, 'ইনভেস্টর'।

ওয়ারেন বাফেটের জন্ম ১৯৩০ সালে, যুক্তরাষ্ট্রের নেব্রাস্কার ওমাহায়। ছেলেবেলায় সব শিশুরই নায়ক তার বাবা। বাফেটেরও তাই। তখনই ঠিক করে ফেললেন তাঁকেও ইনভেস্টর হতে হবে। যখন ছয়-সাত বছর বয়স, স্কুলের খাতায় নিজের নাম লিখে রেখেছিলেন 'ওয়ারেন বাফেট : ফিউচার ইনভেস্টর'। বাফেট সেটাই হয়েছেন। তাঁর বয়সের অন্য শিশু-কিশোরেরা যখন ব্যস্ত ছিল খেলার মাঠে, তিনি তখন ব্যস্ত থেকেছেন অর্থ উপার্জনে।

দাদার ছিল গ্রোসারি বা মুদির দোকান। বাফেট সেই বয়সেই নিজের সম্পদমূল্য বাড়াতে সপ্তাহে ৫ ডলার বেতনে দাদার দোকানে কাজ নেন। মাত্র ছয় বছর বয়সেই দাদার দোকান থেকে ২৪ সেন্টে ৬ প্যাকেট কোকাকোলা কিনে একটু দূরে গিয়ে বিক্রি করে ৫ সেন্ট মুনাফা করেছিলেন। এরপর কিছু অর্থ জমিয়ে ১১ বছর বয়সে ৩৮ ডলার করে সিটিজ সার্ভিসের ছয়টি শেয়ার কেনেন তিনি। এর তিনটি দিয়ে দেন বোনকে। তবে জীবনের প্রথম শেয়ার ব্যবসা শুরুতে হতাশ করেছিল তাঁকে। কিছুদিনের মধ্যেই শেয়ারের দাম কমে ২৭ ডলার হয়ে যায়। কিন্তু তিনি অপেক্ষা করেছেন। শেয়ারের দর বেড়ে ৪০ ডলার হতেই বিক্রি করে দেন। তিনি এখনো মানেন, সেটি ছিল তাঁর ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ, কিছুদিনের মধ্যেই ওই শেয়ারের দাম আরও বেড়ে ২০০ ডলার হয়ে যায়। সেই ঘটনা থেকে তিনি বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় শিক্ষাটা পেয়েছিলেন। আর তা হলো অধ্যবসায়, যার প্রতিফলন পুরো জীবন জুড়েই ছিল।

কিন্তু তিনটি শেয়ার কিনে সামান্য লাভে সন্তুষ্ট ছিলেন না বাফেট। লক্ষ্য ছিল আরও বড়। পুঁজি বাড়াতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চুইংগাম, পত্রিকা ও কোকাকোলা বিক্রি করা শুরু করেন। স্থানীয় এক সেলুনে পোকার খেলার যন্ত্রও বসান তিনি। এতে কিছু আয় বাড়লে বাবা ব্যাংকে একটি হিসাব খুলে দেন। একসময় ব্যাংক থেকে নোটিশ এল যে ওয়ারেন বাফেটের নামে কিছু ডলার জমা পড়েছে। ফলে এখন আয়কর দিতে হবে। সেই সময়ে ওয়ারেন বাফেটের বাবা ছিলেন একজন কংগ্রেসম্যান। শেয়ার ব্যবসা ছেড়ে নির্বাচন করে জিতেছেন। ছেলেকে বললেন আয়কর দিতে। কারণ, তখন থেকেই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখতে হবে। বাফেটের বয়স তখন মাত্র ১৪ বছর। বয়স কম হওয়ায় স্থানীয় আয়কর বিভাগ ৩৫ ডলার ফেরত দিলে বাফেট তা দিয়ে একটি বাইসাইকেল কিনেছিলেন। সেই বাইসাইকেল তিনি চালাতেন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেও।

২.

ওয়ারেন বাফেটের এখন অনেকগুলো পরিচয়। তিনি বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ ধনী। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৬ হাজার ৬৬৪ কোটি ডলার। টাকার অঙ্কে যা ৫ লাখ ২৪ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা। একটু মনে করিয়ে দিই আমাদের নতুন বাজেটটি হচ্ছে ৩ লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকার।

ওয়ারেন বাফেট এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় জনহিতৈষীর একজন। তিনি তাঁর সম্পদের ৯৯ শতাংশই দানের ঘোষণা দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত তিনি দান করেছেন ২ হাজার ১৫০ কোটি ডলার।

বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ ধনী ওয়ারেন বাফেট

যারা শেয়ারবাজারে আজ বিনিয়োগ করে কালই লাখপতি হতে চান তাঁদের অবশ্যই ওয়ারেন বাফেটের জীবনীটা পড়ে নেওয়া উচিত। কারণ, কেবল শেয়ার ব্যবসা করেই তিনি বিশ্বের অন্যতম সেরা ধনী হয়েছেন।

ওয়ারেন বাফেট নিয়ে একটা মধুর বিতর্ক আছে। তিনি বিনিয়োগকারী হিসেবে বেশি ভালো নাকি ব্যবস্থাপক হিসেবে। বেশির ভাগই মনে করেন, বাফেট যত ভালো বিনিয়োগকারী, তার চেয়েও ভালো ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপক। ব্যবসা-বাণিজ্য কীভাবে পরিচালনা করতে হয়, তা ওয়ারেন বাফেটের চেয়ে ভালো কে আর জানে। তারপরও যাদের মনে সন্দেহ আছে তাদের জন্য বলছি, বিল গেটসও ওয়ারেন বাফেটের কাছ থেকেই ব্যবসা পরিচালনা পরামর্শ নেন।

ইউএসএ টুডে ২০০৮ সালে হিসাব দিয়ে বলেছিল ওয়ারেন বাফেটকে নিয়ে লেখা বইয়ের সংখ্যা ৪৭। জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে এর চেয়ে বেশি বই রয়েছে কেবল দালাই লামাকে নিয়ে। এর পরের আট বছরে নিঃসন্দেহে বইয়ের সংখ্যা আরও অনেক বেড়েছে। ২০১২ সালে টাইম ম্যাগাজিন ওয়ারেন বাফেটকে সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষদের একজন বলেছিল। সেই প্রভাব একটুও কমেনি।

ওয়ারেন বাফেট এখন বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)। ১৯৬৫ সালে ডুবতে থাকা এ প্রতিষ্ঠানটি কিনেছিলেন। আর এখন প্রতিষ্ঠানটির মোট সম্পদ ৫৫ হাজার ২২৫ কোটি ডলার, ২০১৫ সালে নিট আয় ছিল ২ হাজার ৪০৮ কোটি ডলার। এখানে কাজ করেন ৩ লাখ ৩১ হাজার মানুষ। বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম তালিকাভুক্ত হোল্ডিং কোম্পানি।

৩.

ওয়ারেন বাফেটের সাফল্যের রহস্য কী? বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬৫টি। কোনো প্রতিষ্ঠানেই নাক গলান না তিনি। তাঁর কাজ কেবল বার্ষিক সভায় যোগ দেওয়া। সবগুলো প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা সিইও নিয়োগ দেওয়া আছে। তাদের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছেন সব।

বাফেটের নীতি হলো, প্রতিষ্ঠানকে প্রধান নির্বাহী-ম্যানেজারের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। সুতরাং মূল কাজ হচ্ছে একজন যোগ্য সিইও বা ম্যানেজার খুঁজে বের করা। বিশেষ মানবিক গুণ থাকলেও বুদ্ধিহীন লোকের পক্ষে দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। আরামপ্রিয়দের ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে না, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়েন তাঁরা। আন্তরিকতা কম থাকা ব্যক্তিদের আবার উন্নতির চেষ্টা থাকে না খুব একটা। একধরনের মানুষ আছেন, যাঁদের পেশা শুধু উপার্জনের মাধ্যম নয়, ব্যক্তিগত গর্বও বটে। পেশাগত সমস্যা-জটিলতায় আক্রান্ত হলে এঁরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসার, অনুকূল সময়ে তাঁদের চেষ্টা থাকে উন্নতির। এ ধরনের ব্যক্তিকেই খুঁজে বের করেন তিনি।

ওয়ারেন বাফেট মনে করেন, সর্বোচ্চ সুফল পেতে চাইলে ওই রকম ব্যক্তিদের দায়িত্ব দিতে হবে। এ ধরনের ব্যক্তিরা কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীনচেতা হন। মানুষ কোনো ক্ষেত্রকে আপন ভাবতে শুরু করলে সেখানে স্বাধীনতা চায়ই। ঠিক এই স্বাধীনতাটাই তিনি দেন।

বছরে একবার বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের বার্ষিক সভা হয়। সেখানে ওয়ারেন বাফেট প্রতিষ্ঠানের সবাই এবং সব শেয়ারধারীর উদ্দেশে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন থেকে শুরু করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সবকিছু উল্লেখ থাকে। ১৯৬৫ সাল থেকে তিনি প্রতিবছর একটি করে চিঠি লিখে আসছেন। বলা হয়, সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ পরামর্শ লুকিয়ে থাকে ওয়ারেন বাফেটের ওই বার্ষিক চিঠিতেই। বিল গেটসও এই চিঠির অপেক্ষায় থাকেন প্রতিবছরই।

প্রতিবছর নিয়ম করে চিঠি লিখলেও ২০১৪ সালের চিঠিটিকে বলা হয় বিশেষ কিছু। ওই চিঠির দ্বিতীয় অংশের শিরোনাম ছিল 'বার্কশায়ার-অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ'। প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস বলার পাশাপাশি আগামী ৫০ বছরে বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে কীভাবে চলবে তার একটি রূপরেখাও দিয়েছেন তিনি। বিল গেটস লিখেছেন, তিন বাফেটের ৫০টি চিঠিই পড়েছেন। কিন্তু এই চিঠিটি সেরা।

চিঠিটির শুরুতেই তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, সামনের দিনগুলোতে প্রতিষ্ঠানটির অর্থনৈতিক সংকটে পড়ার সম্ভাবনা শূন্য।

একসময় তিনি থাকবেন না। তাঁর উত্তরসূরির জন্য সবচেয়ে বড় পরামর্শ হচ্ছে, তাঁকে অবশ্যই ব্যবসা-বাণিজ্যের তিনটি খারাপ দিক থেকে দূরে থাকতে হবে। যাকে তিনি বলেছেন, 'এবিসি অব বিজনেস ডিকেই'। যেমন : অ্যারোগেন্স (ঔদ্ধত্য), ব্যুরোক্রেসি (আমলাতন্ত্র) এবং কমপ্লাসেন্সি (আত্মতুষ্টি)।

বাফেটের উত্তরসূরি কীভাবে সিইও বাছাই করবেন তাও চিঠিতে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক জায়গায় বসাতে হবে। আর সিইও হতে হবে তুলনামূলকভাবে তরুণ, যাতে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে পারেন, ৬৫ বছরে অবসর নেওয়ার ভাবনায় আচ্ছন্ন না থাকেন।

৪.

ওয়ারেন বাফেটের লেখা চিঠি বিশ্লেষণ করে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে। এর মধ্যে বিখ্যাত হয়ে আছে 'ম্যানেজমেন্ট সিক্রেটস'। সেখান থেকে কিছু কথা বলা যেতে পারে।

ক. ওয়ারেন বাফেট প্রতিবছর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সিইওর কাছে একটি চিঠি দেন। সেখানে লেখা থাকে, আজ মারা গেলে কাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানে আপনার পদে কে যোগ দিতে পারবে লিখে পাঠান। বাফেটের মতে, কোম্পানির ভেতর থেকেই উত্তরসূরি খুঁজে নেওয়া ভালো

খ. বাফেট মনে করেন, যে জিনিস আমি নিজের জন্য কিনব না, তা অন্যকে কেনার উপদেশ দেব না

গ. বাফেটের নীতি হলো, ভুল যত ক্ষুদ্র বা অগুরুত্বপূর্ণই হোক, বোঝামাত্র সেটি অকপটে স্বীকার করে নেওয়া এবং শোধরানোর চেষ্টা চালানো প্রয়োজন। ব্যবসার জন্য এটা জরুরি।

ঘ. বাফেটের পরামর্শ হচ্ছে, সুসময়ে কৃচ্ছ্র সাধন ও দুঃসময়ে সঞ্চিত অর্থ ব্যয়।

ঙ. বাফেট বলতেন, একজন ভালো ম্যানেজার বড় ফুটবল কোচের মতো। তাঁরা নিজে মাঠে না নেমেও দলকে খেলান ও জিতিয়ে আনেন। আবার জয়ী হওয়ার উপাদান রেখে যান টিমের মধ্যে, যাতে তিনি না থাকলেও জিততে পারে দলটি।

তথ্যসূত্র : বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের ওয়েবসাইট, ব্লুমবার্গ, দি বাফেট রিপোর্ট-অধ্যাপক জন প্রাইস, দি ওয়ারেন বাফেট ওয়ে-রবার্ট জি হাগস্ট্রম, ম্যানেজমেন্ট সিক্রেটস-বণিক বার্তা।

জুলাইয়ে বেড়েছে তেলের দাম

কাতার প্রতিনিধি

চলতি জুলাই মাস থেকে বেড়েছে তেলের দাম। জ্বালানি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে একটি মূল্যতালিকা প্রকাশ করে এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

চলতি বছর থেকে কাতারে তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের দামের সঙ্গে মিল রেখে নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। ওই সিদ্ধান্তের আলোকে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। নতুন তালিকা অনুযায়ী জুলাই মাস থেকে পেট্রলের দাম লিটারপ্রতি ১০ দিরহাম বাড়বে। সে ক্ষেত্রে সুপার গ্রেড ও ডিজেল সমান দামে বিক্রি হবে।

এ ছাড়া প্রিমিয়াম ও সুপার পেট্রলের দামও লিটারপ্রতি ১০ দিরহাম করে বাড়বে। গত জুন মাসে প্রতি লিটার প্রিমিয়াম পেট্রল ছিল ১ দশমিক ২০ রিয়াল এবং সুপার পেট্রল ছিল ১ দশমিক ৩০ রিয়াল। জুলাই মাস থেকে এগুলোর দাম বেড়ে যথাক্রমে ১ দশমিক ৩০ ও ১ দশমিক ৪০ রিয়াল হবে।

ঈদের কেনাকাটা পবিত্র মাহে রমজানের পর মুসলিম বিশ্বে উদ্‌যাপিত হয়েছে পবিত্র ঈদুল ফিতর। খুশির এই ঈদ উপলক্ষে পরিবার-পরিজনের চাই নতুন কাপড়। কাতারের নাগরিক ও অভিবাসীরা তাই ঈদের আগে নতুন জামাকাপড় আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে ভিড় করেন শপিং মলগুলোতে। ৩ জুলাই রাজধানী দোহার একটি শপিং মল থেকে তোলা ছবি ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

বিশ্ববাজারে তেল বিক্রির জন্য নতুন প্রতিষ্ঠান হচ্ছে

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল বিক্রির লক্ষ্যে নিবন্ধিত একটি জ্বালানি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খসড়া প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়েছে। গত ২২ জুন অনুষ্ঠিত বৈঠকে ওই খসড়া প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

ওই বৈঠকে কাতারের বাইরে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়সংক্রান্ত ২০০৭ সালে জারিকৃত ১৫ নম্বর অধ্যাদেশে কিছু সংশোধনী প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়। পরে তা পর্যালোচনার জন্য উপদেষ্টা পরিষদে পাঠানো হবে।

এই খসড়া প্রস্তাব অনুসারে কাতার পেট্রোলিয়ামের প্রতিনিধিত্বে সম্পূর্ণ কাতারের মালিকানাধীন নতুন একটি লিমিটেড কোম্পানি গড়ে তোলা হবে। এই কোম্পানি সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল বিক্রি করবে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওই অধ্যাদেশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব অনুসারে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রস্তাবিত লিমিটেড কোম্পানির প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করবে কাতার পেট্রোলিয়াম।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে গাড়ি ও লিমোজিন ভাড়াসংক্রান্ত দুটি খসড়া প্রস্তাবও অনুমোদন করা হয়। এসব প্রস্তাবে যানবাহন ভাড়া প্রদানের শর্ত নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্সপ্রাপ্তি ও বাতিলের শর্তাবলি নির্ধারণ করা হয়। গাড়ি ও যানবাহনের মডেল অনুসারে ভাড়া প্রদানের শর্তাবলি নির্ধারিত হবে।

অন্য আরেক প্রস্তাবে নির্বাহী লাইসেন্স দেওয়ার নিয়ম, মেয়াদ, লাইসেন্স বজায় রাখার শর্তাবলি ও তা বাতিলের নিয়মাবলি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়া মন্ত্রিসভার বৈঠকে নির্ধারিত কর্মসূচি অনুসারে দরপত্র ও ইজারাসংক্রান্ত নতুন একটি কমিটি গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুসারে এই কমিটির প্রধান হবেন হাইকোর্টের একজন বিচারপতি। ওই বিচারপতিকে নির্বাচন করবেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিচার কাউন্সিল। এই কমিটিতে আরও থাকবেন সরকারি কার্যপ্রণালি সম্পর্কে অভিজ্ঞ দুজন ব্যক্তি। তাঁরা দরপত্র ও ইজারাসংক্রান্ত চুক্তির বিভিন্ন সমস্যা দেখভাল করবেন।

পেট্রল স্টেশন বন্ধ, জ্বালানি নিতে দুর্ভোগ চালকদের

কাতার প্রতিনিধি

রাজধানী দোহার প্রাণকেন্দ্রে একটি জ্বালানি স্টেশনের নিবন্ধনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় সম্প্রতি এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ ছাড়া সংস্কারকাজের জন্য গত কয়েক মাসে দোহায় বেশ কয়েকটি স্টেশন বন্ধ রাখা হয়। ফলে দোহা ও আশপাশের এলাকায় জ্বালানিসেবা বিঘ্নিত হচ্ছে।

দোহার কেন্দ্রস্থল আলমান্নাই চত্বরের বিপরীতে আলরুমাইলা হাসপাতালের কাছে বিন মাহমুদে আল খালিজ আল আরাবি পেট্রল স্টেশনের লাইসেন্সের মেয়াদ এই মাসের শেষে উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৯ জুন স্টেশনটির পুনর্নিবন্ধনের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

আলখালিজ আলআরাবি পেট্রল স্টেশনের একজন কর্মী বলেন, 'মালিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে স্টেশনের নিবন্ধনের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।' আলখালিজ আলআরাবি পেট্রল স্টেশনটি দোহায় সবচেয়ে ব্যস্ত পেট্রল স্টেশনগুলোর মধ্যে অন্যতম। তবে আশপাশের স্টেশনগুলো চেয়ে এখানে সুবিধা কম। স্টেশনটির ভেতরে স্থান সীমিত। যার কারণে জ্বালানি নিতে আসা গাড়ি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সড়কের এক পাশ দখল করে অপেক্ষায় থাকে। ফলে হামাদ জেনারেল হাসপাতালের মোড় থেকে আসা মোটরগাড়ি চালকেরা মাশাইরিব অথবা বিন মাহমুদে দীর্ঘ যানজটে পড়ে।

আলখালিজি দোহার কেন্দ্রে অবস্থিত সবচেয়ে পুরোনো জ্বালানি স্টেশন। তবে অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকায় যানজট বাড়ানোর কারণে এ স্টেশনটি বন্ধের কাজ শুরু হয়েছে। দোহায় বন্ধ হতে যাওয়া সর্বশেষ স্টেশন আলখালিজি। তবে সংস্কারকাজ করে এই স্টেশন আবার চালু হতে

> নতুন জ্বালানি স্টেশন করেও চাপ কমানো যাচ্ছে না। অন্যদিকে দোহায় গত কয়েক মাসে বেশ কিছু পুরোনো জ্বালানি স্টেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আশপাশের স্টেশনে গাড়ির চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে

পারে অথবা এখানে নতুন কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। অন্যদিকে দোহার আরেকটি পুরোনো জ্বালানি স্টেশন 'দোহা পেট্রল' দুই মাস আগে বন্ধ করা হয়। তবে এই স্টেশনের দোকান ব্যবসায়ীরা এখনো ব্যবসা বন্ধ করেননি। স্টেশন স্থায়ীভাবে নাকি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছে, সে ব্যাপারটি পরিষ্কার নয়।

এদিকে কয়েক মাস আগে রিং সড়কের মোড়ে অবস্থিত ফ্যালকন পেট্রল স্টেশন বন্ধ করা হয়। এসব পুরোনো জ্বালানি স্টেশন অকার্যকর হয়ে পড়ায় বন্ধ করা হচ্ছে। বর্তমানে জ্বালানি সমস্যা মোকাবিলায় বেশ কয়েকটি পেট্রল স্টেশন ও ভ্রাম্যমাণ জ্বালানি স্টেশন নির্মাণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে ওকুদ। ইতিমধ্যে নতুন কিছু স্টেশনের কাজ শুরু হয়েছে। এ ছাড়া পুরোনো অনেক স্টেশন সংস্কার করে চালু করা হবে।

কাতারে প্রতিদিন পাঁচ হাজারের বেশি গাড়ি নিবন্ধন করে সড়কে নামছে। এর ফলে নতুন জ্বালানি স্টেশন করেও চাপ কমানো যাচ্ছে না। অন্যদিকে দোহায় গত কয়েক মাসে বেশ কিছু পুরোনো জ্বালানি স্টেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আশপাশের স্টেশনে গাড়ির চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। দার আল কুতুব মোড়ের কাছে বসবাসকারী একজন অভিবাসী বলেন, 'সাধারণত পেট্রল স্টেশনে ভিড় থাকায় আমি ওই সময়ে চলাচল করি না। কিন্তু বৃহস্পতিবার দুপুরে জাইদা টাওয়ার সড়কে ওকুদ স্টেশনের কাছে ২০ মিনিট যানজটে আটকে ছিলাম।'

ব্যাংক সড়কের কাছে নতুন পেট্রল স্টেশন

নিউ ওয়ার্ল্ড সেন্টারের বিপরীতে পুরোনো একটি ওকুদ পেট্রল স্টেশন বন্ধ হয়। ইতিমধ্যে এ স্টেশন সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে। ওকুদ পেট্রল আশাবাদী, শিগগিরই এটি খোলা হবে। এর ফলে এই এলাকার অন্যান্য পেট্রল স্টেশনের ওপর চাপ কমবে। দোহার উপকণ্ঠে অবস্থিত সব পেট্রল স্টেশনেই পিক হাওয়ারে গাড়ির প্রচুর চাপ থাকে।

দোহার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকার অবস্থা অন্যান্য এলাকার চেয়ে আরও ভয়াবহ। দোহার সবচেয়ে জনবহুল এ অঞ্চলে মাত্র তিনটি পেট্রল স্টেশন রয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকার ৩৩ নম্বর সড়কে আল ওয়াতান জ্বালানি স্টেশন, ২ নম্বর সড়কে আলসালাম এবং ১০ নম্বর সড়কের বিপরীতে ইসলামি সেন্টারসংলগ্ন ওকুদ পেট্রল স্টেশন রয়েছে। এ ছাড়া ১০ নম্বর সড়কে একটি পেট্রল স্টেশন সংস্কারের জন্য বন্ধ হয়েছে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকার একজন গাড়িচালক বলেন, 'এখানে যেকোনো জ্বালানি স্টেশনে ৩০ মিনিটের কম সময়ে জ্বালানি সংগ্রহ করা যায় না। বর্তমানে ২ নম্বর সড়ক ও ৩৩ নম্বর সড়কে দুটি পেট্রল স্টেশনের সংস্কারের কাজ চলছে।'

গাড়ি বাড়তে থাকায় কাতারে জ্বালানি স্টেশনের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। সম্প্রতি ওকুদ ২৫টি নতুন মোবাইল পেট্রল স্টেশনের নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে। এর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কয়েকটি স্টেশন স্থাপন করা হবে।

জিডিপির হার আগের বছরকে ছাড়াতে পারে ৩.৯০ শতাংশ

কাতার প্রতিনিধি

চলতি বছর অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে তেজিভাব বিরাজ করায় কাতারের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার আগের বছরকে ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে অর্থনৈতিক পূর্বাভাসে বলা হয়েছে। ২০১৬ সালের সম্ভাব্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ, যা আগের বছরের তুলনায় দশমিক ২ শতাংশ বেশি।

কাতারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে আগামী তিন বছর কাতারের সম্ভাব্য জিডিপি বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কার্বনভিত্তিক জ্বালানির পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোয় আগামী তিন বছর ধরে জিডিপি বৃদ্ধির হার সাড়ে ৩ শতাংশের কাছাকাছি ওঠানামা করবে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, তেলের বাজারে মন্দাভাব বিরাজ করা সত্ত্বেও কাতারের অর্থনীতি ৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। নবায়নযোগ্য বিকল্প জ্বালানির ব্যবহারের প্রকল্প হাতে নেওয়ায় এবং বাজরান গ্যাস প্রকল্পে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনীতির চাকা এ বছর সচল থাকবে।

অর্থনীতিবিদেরা ধারণা করছেন, চলতি বছর উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (জিসিসি) সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে কাতারের জিডিপির হার সর্বোচ্চ হবে। তবে ২০১৮ সালে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৩ দশমিক ২ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয়ের ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির হার থাকবে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। জানুয়ারিতে হঠাৎ করে তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ও গত বছরের শেষ দিকে পানি ও বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্তে কাতারের অভ্যন্তরীণ বাজারে খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বন্ধ হতে পারে আলখালিজি আলআরাবি জ্বালানি স্টেশন

কাতার প্রতিনিধি

জ্বালানি তেল নেওয়ার জন্য আসা যানবাহনের চাপ সামলাতে হিমশিম খাওয়ায় দোহার শহরতলিতে অবস্থিত আরও একটি জ্বালানি স্টেশন বন্ধের মুখে পড়েছে।

জানা গেছে, আলমানার গোলচত্বরের কাছে আলরুমাইলা হাসপাতালের বিপরীতে অবস্থিত আলখালিজি আলআরাবি ফিলিং স্টেশনের লাইসেন্সের মেয়াদ আগামী মাসেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ওই প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন করা হয়নি।

স্টেশনে কর্মরত একজন কর্মী জানান, লাইসেন্স নবায়নের লক্ষ্যে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক চলছে। অবশ্য এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের কোনো মতামত জানা যায়নি।

ওই জনবহুল এলাকায় এটিই একমাত্র জ্বালানি স্টেশন। ফলে ব্যস্ত সময়ে জ্বালানি তেলের অপেক্ষায় থাকা যানবাহনের বিরাট সারি পার্শ্ববর্তী সড়কের বিশাল অংশ দখল করে থাকে। ফলে দীর্ঘ যানজটে আটকে পড়ে দুর্ভোগ পোহাতে হয় হামাদ হাসপাতাল থেকে মেসাইরগামী ও বিন মাহমুদ থেকে আসা যানবাহনের যাত্রীদের।

সম্প্রতি সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে দোহা নগরের অভ্যন্তরে বেশ কিছু জ্বালানি স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

দোহা নগরের কেন্দ্রস্থল দোহা

> লাইসেন্স নবায়নের লক্ষ্যে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক চলছে। অবশ্য এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের কোনো মতামত জানা যায়নি

জাদিদে অবস্থিত অন্যতম পুরোনো দোহা পেট্রল স্টেশন দুই মাস আগে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে এটি কি স্থায়ী না অস্থায়ী ভিত্তিতে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, সে বিষয়ে আশপাশের দোকানিরা নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি।

এর কয়েক মাস আগে ডি রিং রোডে অবস্থিত ফ্যালকন স্টেশনটিও বন্ধ হয়ে যায়। গাড়ির জ্বালানি সরবরাহ সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ওকুদ সারা দেশে নতুন করে বেশ কিছু জ্বালানি স্টেশন স্থাপন করেছে। এ ছাড়া আরও কিছু স্টেশন স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে। তবে প্রতি বছরই যানবাহনের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যমান জ্বালানি স্টেশনগুলোর ওপর চাপ পড়ছে। ক্রমবর্ধমান গাড়ির চাপ সামলাতে পারছে না বিদ্যমান স্টেশনগুলো।

দোহা পেট্রল স্টেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পার্শ্ববর্তী জাদা টাওয়ারের সম্মুখে অবস্থিত জ্বালানি স্টেশনের ওপর চাপ অনেক বেড়েছে। ফলে ওই এলাকায় জ্বালানি সংগ্রহে আসা গাড়ির কারণে সারা দিন যানজট লেগেই থাকে।

জ্বালানি তেল সংগ্রহের লক্ষ্যে অপেক্ষমাণ যানবাহনের চালকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দিনের ব্যস্ততম সময়ে তেল সংগ্রহের লক্ষ্যে ২০-৩০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

ব্যাংক স্ট্রিটে ওকুদের নতুন জ্বালানি স্টেশন স্থাপনের কাজ চলছে। শিগগিরই ওই স্টেশন চালু করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, দোহা শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অবস্থিত অধিকাংশ জ্বালানি স্টেশনে প্রতিদিন প্রচুর ভিড় দেখা যায়। শিল্প এলাকার অবস্থা আরও করুণ। শহরের ব্যস্ততম শিল্পাঞ্চলে মাত্র তিনটি জ্বালানি স্টেশন রয়েছে। একজন চালক জানান, মাত্র তিনটি জ্বালানি স্টেশন যানবাহনের চাপ সামলাতে পারছে না। ফলে একেকটি গাড়িকে জ্বালানি তেল সংগ্রহের জন্য স্টেশনে আধা ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

গাড়ির জ্বালানি তেলের সমস্যার সমাধানে শহরের অভ্যন্তরে আরও ২৫টি জ্বালানি স্টেশন স্থাপন করা হবে। এসব ছাড়াও দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আরও ২০টি জ্বালানি স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে ওকুদ।

বাংলাদেশ সাংবাদিক ফোরামের নতুন কমিটির অভিষেক

কাতার প্রতিনিধি

কমিউনিটি নেতাদের শুভেচ্ছা জানানো ও ইফতার মাহফিলের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে কাতারে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশ সাংবাদিক ফোরাম কাতার-এর নতুন কমিটির অভিষেক। এ উপলক্ষে ২৮ জুন সন্ধ্যায় কাতারের নাজমায় রমনা রেস্তোরাঁয় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অভিষেক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সাংবাদিক ফোরাম কাতারের সভাপতি অধ্যাপক এ কে এম আমিনুল হক। প্রধান অতিথি হিসেবে কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব নাজমুল হক। কাতারের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কাতার নিউজ এজেন্সির প্রধান সম্পাদক এবং কাতারের সাংবাদিকতা জগতের পুরোধা ব্যক্তিত্ব শেখ খালেদ আবদুল্লাহ আযাযিয়ারাহ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

তামীম রায়হানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের কাতার শাখা ব্যবস্থাপক মো. মোস্তফা এবং বাংলাদেশ এমএইচএম স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ জসিমউদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন উপদেষ্টা নূর মোহাম্মদ, সহসভাপতি ইউসুফ পাটোয়ারি ও আকবর হোসেন, যুগ্ম

কাতারে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশ সাংবাদিক ফোরামের নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানের মঞ্চে অতিথিরা ● প্রথম আলো

সাধারণ সম্পাদক এম এ সালাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি শাহাবউদ্দীন মো. শামীম, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হানিফ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, সাহিত্য সম্পাদক মফিজুল ইসলাম প্রমুখ।

বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতাদের মধ্যে কাতার শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি ওমর ফারুক চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি এস এম ফরিদুল হক, চট্টগ্রাম সমিতির সভাপতি শফিকুল ইসলাম তালুকদার, কাতার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম মোল্লা, সাংগঠনিক সম্পাদক লোকমান আহমদ, এনআরবিবিএর সাধারণ সম্পাদক জসিমউদ্দীন, মেলা চট্টগ্রামের সাধারণ সম্পাদক মো. নাছির উদ্দীন, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আলাউদ্দীন আহমদ, জিয়া পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সাজু, জাসদের সভাপতি ইসমাইল, জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, যুবলীগের সভাপতি জাকির হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ আহমদ, রাউজান সমিতির সভাপতি মুহসিন আলী, চট্টগ্রাম সমিতির সহসভাপতি নুরুল আজিম, বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমিতির সভাপতি তুহিনুল হক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান খান, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম খন্দকার, জাতীয়তাবাদী সমর্থক গোষ্ঠীর সভাপতি কাজী ফোরকান রেজাসহ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন শরিফ থেকে তিলাওয়াত করেন মো. ইব্রাহিম খলিল। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন কাতার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কর্মরত ইমাম হাফেজ লোকমান।

দোহায় ১০ লাখ ফুলগাছ রোপণ

কাতার প্রতিনিধি

রাজধানী দোহায় সম্প্রতি ১০ লাখের বেশি ফুল ও বিভিন্ন গাছের চারা লাগিয়েছে কাতার পৌরসভা কর্তৃপক্ষ। সৌন্দর্যবর্ধনের লক্ষ্যে রাস্তার দুই পাশে ও বিভিন্ন পার্কে এসব চারা লাগানো হয়েছে।

রাজধানীতে গাছের চারা লাগানোর দায়িত্ব পালন করেছে পৌরসভার সবুজায়ন ও সৌন্দর্যবর্ধনের দায়িত্বে থাকা উদ্যান বিভাগ।

কাতারের পৌরসভা ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্প্রতি টুইটারে গাছের চারা লাগানোর বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে। টুইটারে দেওয়া বার্তায় বলা হয়, পৌরসভা দোহা সিটিতে ১০ লাখের বেশি ফুলগাছ লাগানো হয়েছে।

পৌরসভার কর্মকর্তারা আশা করছেন, নতুন করে গাছ লাগানোর ফলে দোহা শহর আরও সবুজ ও দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠবে। বিভিন্ন পার্কে ঘুরতে আসা মানুষ বা পথচারীরা এটি উপভোগ করবেন।

সিলেক্ট ইউএস ২০১৬ সম্মেলনে নর্থ ক্যারোলাইনার প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোয়ালিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন ওলাকারা

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে যাত্রা শুরু করছে কোয়ালিটি

কোয়ালিটি গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে যাত্রা শুরু করছে। 'সিলেক্ট ইউএস ২০১৬ ইনভেস্টমেন্ট সামিট'-এ অংশগ্রহণের পর প্রতিষ্ঠানটি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়।

আগামী অর্থবছরে কোয়ালিটি গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাষ্ট্রে অফ শোর, তাজা খাদ্য রপ্তানি এবং খুচরা বাজারসংশ্লিষ্ট খাতে বিনিয়োগ করবে। ইতিমধ্যে কোয়ালিটি গ্রুপ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি সই করেছে। এসব মার্কিন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় লুইজিয়ানা, নর্থ ক্যারোলাইনা এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রাথমিকভাবে যাত্রা শুরু করবে প্রতিষ্ঠানটি।

কোয়ালিটি গ্রুপ ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন ওলাকারা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে যাত্রা শুরুর ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর লক্ষ্যেই তারা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে এসেছেন। কাতারে প্রতিনিধিত্বকারী ইউএস কমার্শিয়াল সার্ভিসের আমন্ত্রণে কোয়ালিটি গ্রুপ 'সিলেক্ট ইউএস ২০১৬ ইনভেস্টমেন্ট সামিট'-এ অংশ নিয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ওই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মতো পৃথিবীর কোনো দেশ বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে না।

কোয়ালিটি গ্রুপ ইন্টারন্যাশনাল লুইজিয়ানাভিত্তিক একটি নামীদামি প্রতিষ্ঠানের নানা শিল্পপণ্য উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে রপ্তানির অনুমোদন পাবে। শিগগিরই এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি চুক্তি হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে সরাসরি ফল ও সবজি রপ্তানির জন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিগগিরই চুক্তি সই হবে। বিজ্ঞপ্তি।

প্রথম আলো
بروتوم آلو النسخة الخليجية الأسبوعية
সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ

এখন নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে
কাতারজুড়ে বিভিন্ন বাংলাদেশি রেস্তোরাঁয়

ভুইয়া রেস্তোরাঁ, মুনতাজা
ফেনী রেস্তোরাঁ, মুনতাজা
স্টার অব ঢাকা রেস্তোরাঁ, দোহাজাদিদ
হইচই রেস্তোরাঁ, নাজমা
আনন্দ রেস্তোরাঁ, নাজমা
রমনা রেস্তোরাঁ, নাজমা
হানিকুইন ক্যাফেটেরিয়া, রাইয়ান
প্রবাসী হোটেল, মদিনাখলিফা
আলরাবিয়া রেস্তোরাঁ, বিনওমরান
কুমিল্লা রেস্তোরাঁ, দোহা
বনানী রেস্তোরাঁ, দোহা
চাঁদপুর হোটেল, মাইজার
জাল ক্যাফেটেরিয়া,মাইজার
আলরাহমানিয়া রেস্তোরাঁ, সবজিমার্কেট
মিষ্টিমেলা, সবজিমার্কেট
বাংলাদেশ ট্রেডিং কমপ্লেক্স, আলআতিয়া মার্কেট
আলশারিফ রেস্তোরাঁ, আলআতিয়া মার্কেট
আলফালাক রেস্তোরাঁ, আলআতিয়া মার্কেট
সাফির ক্যাফেটেরিয়া,মদিনামুররা
আলবুসতান হোটেল, মদিনামুররা
ঢাকা ভিআইপি রেস্তোরাঁ, ওয়াকরা
আসসাওয়াহেল রেস্তোরাঁ, ওয়াকরা
আননামুজাযি রেস্তোরাঁ, মিসাইয়িদ মার্কেট

১২৫ কাতারি রিয়াল
গ্রাহক হোন
১ বছরের জন্য
প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে আপনার বাসা, অফিস, প্রতিষ্ঠান কিংবা যেকোনো ঠিকানায় প্রথম আলো পৌঁছে যাবে
গ্রাহক বা এজেন্ট হতে চাইলে যোগাযোগ করুন
5549 2446, 30106828

বাহরাইনে চুল প্রতিস্থাপন

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনের চুল পড়ে টাক পড়ে যাওয়া মানুষের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছে মিডল ইস্ট মেডিকেল সেন্টার। টাক সমস্যার সমাধানে বাহরাইনিদের এখন আর দেশের বাইরে যেতে হবে না। শীর্ষস্থানীয় স্বাস্থ্যসেবাদাতা এই প্রতিষ্ঠান এখন টাক মাথায় চুল প্রতিস্থাপনের পূর্ণাঙ্গ সুযোগ দিচ্ছে।

সম্প্রতি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, নতুন পদ্ধতিতে কম খরচে অল্প সময়ে মাথায় চুল বসানো হচ্ছে। তাই চুল প্রতিস্থাপনের জন্য বাহরাইনিদের এখন আর বিদেশে যেতে হবে না।

মিডল ইস্ট মেডিকেল সেন্টার তাদের গ্রাহকদের পুরো মাথায় চুল বসানোর নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এতে অস্ত্রোপচারের পর আর কোনো সমস্যা থাকবে না। এ পদ্ধতি প্রয়োগের তত্ত্বাবধান করবেন সুপরিচিত শল্যচিকিৎসক ডা. জিতেশ শেঠি। তিনি ফলিকুলার ইউনিট একস্ট্র্যাকশন (এফইউই) প্রয়োগে শল্যচিকিৎসার জন্য খ্যাত। এটা মাথায় চুল বসানোর সর্বাধুনিক পদ্ধতিগুলোর একটি।

ডা. জিতেশ শেঠি বলেন, এই পদ্ধতি নিরাপদ। এটা কার্যকর বলেই বিশ্বজুড়ে গৃহীত হয়েছে। এতে লোকজন টাক সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে। চুল প্রতিস্থাপনের চাহিদা দিনে দিনে বাড়ছে। মানুষও এ বিষয়ে সচেতন হয়েছে।

সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন**

মালয়েশীয় নাগরিকের ৫ বছর কারাদণ্ড

জাল ক্রেডিট কার্ডে দেড় লাখ দিনারের কেনাকাটা

প্রথম আলো ডেস্ক

শত নয়, হাজার নয়; দেড় লাখ দিনার বলে কথা। বিপুল পরিমাণের এ অর্থ দিয়ে শুধু দামি পোশাক, অলংকার কিনেই সাধ মেটেনি তাঁর। কিনেছেন বিলাসী অন্যান্য সামগ্রী। কাটিয়েছেন পাঁচতারা হোটেলে। আর এর সবই করেছেন ২৮টি জাল ক্রেডিট কার্ডে।

> জাল ক্রেডিট কার্ডগুলো দিয়ে তিনি বিলাসী সামগ্রী কিনতে মালয়েশিয়া থেকে বাহরাইনে এসেছিলেন। পছন্দের জিনিসপত্র কিনে একটি দোকান থেকে দামি ঘড়ি কেনার চেষ্টার সময় ধরা পড়েন

২৪ বছর বয়সী মালয়েশীয় এক ব্যক্তি বাহরাইনে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটান। তবে শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হয়েছে তাঁকে। জালিয়াতির দায়ে তাঁকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন বাহরাইনের একটি আদালত।

গত ১৬ জানুয়ারি বাহরাইনের একটি নামী বিপণিবিতান কেন্দ্রের একটি দোকান থেকে নয় হাজার দিনারে ঘড়ি কিনতে গিয়ে ধরা পড়ে যান ওই ব্যক্তি। ঘড়ি কেনার সময় তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচরণে সন্দেহ হলে দোকানকর্মী পুলিশকে খবর দেন। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর বেরিয়ে আসে প্রতারণার সব ঘটনা।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তি স্বীকার করেন, তিনি মোট ১ লাখ ৫৭ হাজার ৫০০ দিনার ব্যয়ে বিভিন্ন দোকান থেকে জামাকাপড়, জুতা, অলংকার ও ব্যবহার্য অন্যান্য সামগ্রী কিনেছেন। এতে ব্যবহার করেছেন ২৮টি জাল ক্রেডিট কার্ড।

এ ঘটনায় হওয়া মামলায় গত ২১ জুন আদালত ওই ব্যক্তিকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেন। তাঁর ক্রেডিট কার্ডগুলো জব্দ করা ও সাজা খাটা শেষে তাঁকে দেশে ফেরত পাঠানোর আদেশও দিয়েছেন আদালত। এ রায় ঘোষণার পর আসামিকে আদালতে হাসতে দেখা যায়।

গ্রেপ্তারের পর এই মালয়েশীয় নাগরিক তাঁর কৌঁসুলিদের বলেন, জাল ক্রেডিট কার্ডগুলো দিয়ে তিনি বিলাসী সামগ্রী কিনতে মালয়েশিয়া থেকে বাহরাইনে এসেছিলেন। পছন্দের জিনিসপত্র কিনে একটি দোকান থেকে দামি ঘড়ি কেনার চেষ্টার সময় ধরা পড়েন। তিনি বলেন, '১ লাখ ৫৭ হাজার ৫০০ দিনার মূল্যমানের সামগ্রী কীভাবে কিনতে সক্ষম হয়েছি তা গ্রেপ্তারের পর পুলিশকে বিস্তারিত বলেছি। জাল ক্রেডিট কার্ডে পাঁচতারা হোটেলেও থেকেছি আমি।'

এই ব্যক্তি আরও বলেন, মালয়েশিয়ায় তাঁর এক বন্ধু তাঁকে এই ভুয়া ক্রেডিট কার্ডগুলো দেন। সেসব দিয়ে কেনাকাটা করতে বাহরাইনে পাঠান। কার্ডগুলো ব্যবহার করতে কোনো পিন কোড প্রয়োজন হয়নি।

এদিকে সংশ্লিষ্ট দোকানকর্মী জানান, ক্রেডিট কার্ডে নয় হাজার দিনারের ঘড়ি কেনার মতো লোক ওই ব্যক্তিকে দেখে মনে না হওয়ায় তাঁর মনে সন্দেহ হয়। ওই লোকের পোশাক ও আচরণ এত দামি ঘড়ি কেনার মতো মনে হচ্ছিল না। পরে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানালে সেখান থেকে বলা হয়, ক্রেডিট কার্ডগুলো জাল।

আদালত রায়ে বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁর দোষ স্বীকার করেছেন।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

বাহরাইনে অভিযানে আটক অবৈধ অভিবাসীরা ● সৌজন্যে *ডেইলি ট্রিবিউন*

৪৭ অবৈধ অভিবাসী আটক

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে এক অভিযানে ৪৭ জনকে আটক করা হয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রশাসনিক এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অবৈধ কর্মী নিয়োগ বন্ধ করতে সম্প্রতি চালানো হয় এ অভিযান।

গত ২৮ জুন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, এক পরিদর্শন প্রচারণা কর্মসূচির আওতায় অভিযানটি চালানো হয়। এতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর সহযোগিতায় ভিসা নেই এমন অভিবাসীদের আটক করা হয়েছে। বাহরাইনের নাগরিক ও এখানকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই ছিল এ অভিযানের লক্ষ্য।

দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রশাসনিক এলাকার গভর্নর শেখ আবদুল্লাহ বিন রশিদ আলখলিফার উদ্ধৃতি দিয়ে মন্ত্রণালয় বলেছে, 'নিরাপত্তা পরিস্থিতি পরিদর্শনসংক্রান্ত অন্যতম বৃহৎ এ কর্মসূচির অধীন এই প্রশাসনিক এলাকা থেকে ৪৭ জন অবৈধ কর্মীকে গ্রেপ্তারের কথা গভর্নর ঘোষণা করেছেন। ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা ও দোকানের নিয়ম লঙ্ঘনের বিষয় পরিদর্শনে গঠিত কমিটির কাজের অংশ ছিল এ অভিযানটি।'

মন্ত্রণালয় জানায়, গভর্নরেটের নিরাপত্তা সমন্বয়কারী কর্মকর্তা মেজর ফাহাদ আলখলিফার তত্ত্বাবধানে 'অ্যালুমিনিয়াম বাহরাইন (আলবা)' কারখানার কাছে স্ট্র্যাপ ইয়ার্ড এলাকায় ওই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে সাউদার্ন গভর্নরেটের পুলিশ, শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (এলএমআরএ), জেনারেল ডিরেক্টরেট অব সিভিল ডিফেন্স ও সাউদার্ন এরিয়া মিউনিসিপ্যালিটি সহায়তা করে।

প্রধানমন্ত্রী এইচআরএইচ প্রিন্স খলিফা বিন সালমান আলখলিফার নির্দেশনায় অবৈধ কর্মীদের বিরুদ্ধে সাউদার্ন গভর্নরেটসহ বাহরাইনের চার গভর্নরেটেই এ রকম অভিযান শুরু হয়েছে।

সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন**

মুখোমুখি সংঘর্ষ ইশতিকলাল মহাসড়কে ৩ জুলাই দুটি ব্যক্তিগত গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ট্রাফিক লাইটের খাম্বা ভেঙে পড়ে। আহত দুই গাড়ির চালকদের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ট্রাফিক বাতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ওই মোড়ে এখন ট্রাফিক পুলিশকে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে ● সৌজন্যে *গালফ ডেইলি নিউজ*

২০১৮ সালে চালু হচ্ছে ভ্যাট বাড়বে কর্মসংস্থান

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনে ২০১৮ সালে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) চালু হতে যাচ্ছে। এতে হিসাবরক্ষণ নির্বাহীদের জন্য হাজারো নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হবে। আর্থিক বিশেষজ্ঞরা এমনই আশা প্রকাশ করছেন।

উপসাগরীয় আরব দেশগুলোতে (জিসিসি) ভ্যাট চালুর বিষয়ে বাহরাইনের কর্তৃপক্ষ সম্মত হয়েছে। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে গত ১৬ জুন অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের এক বৈঠকে এ বিষয়ে মতৈক্য হয়। এতে পাঁচ হিসাবরক্ষণ কাজের জন্য হাজারের বেশি চাকরির সুযোগ হবে বলে এক গবেষণা প্রতিবেদনে তথ্য এসেছে। মরগ্যান ম্যাকিংলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রেভর মার্ফি বলেন, তাঁদের অনুমান হলো ২০১৮ সালে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (জিজিসি) সদস্যদেশগুলোতে পাঁচ হাজার নতুন চাকরির সুযোগ হবে। ভ্যাট বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য সেখানে প্রতিযোগিতা হবে।

ইওয়াই মিডল ইস্ট অ্যান্ড নর্থ আফ্রিকার (এমইএনএ) ইনডিরেক্ট ট্যাক্স লিডার ফিনবার সেক্সটন বলেন, জিসিসি অঞ্চলে ভ্যাট প্রয়োগের কাজে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। আগে এ ধরনের হিসাবরক্ষণের জন্য ভারত ও মিসর থেকে বিশেষজ্ঞদের এনে চাহিদা পূরণ করা হতো।

মধ্যপ্রাচ্যে পরোক্ষ কর অংশীদার পিডব্লিউসির প্রতিনিধি জেনাইন দাউ বলেন, নতুন করব্যবস্থা চালুর প্রস্তুতি এখন থেকেই জিসিসি অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুরু করে দিতে হবে। সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন**

মালকিয়ায় আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত, শ্রমিকেরা সহায়তা পেলেন

প্রথম আলো ডেস্ক

মালকিয়ায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আহত ৬৪ জন প্রবাসী কর্মীকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। জুন মাসের মাঝামাঝি ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এসব শ্রমিক সর্বস্ব হারিয়েছেন। স্থানীয় একটি দাতব্য সংস্থা এই সহায়তা দিয়েছে। প্রবাসী এই কর্মীদের অধিকাংশই বাংলাদেশি ও ভারতীয়।

> অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনো কর্মী আহত হননি। ওই সময় তাঁরা কর্মক্ষেত্রে থাকায় বেঁচে গেছেন। তবে তাঁদের কাগজপত্র ও অন্যান্য জিনিস পুড়ে গেছে

মাইগ্র্যান্টস ওয়ার্কার্স প্রোটেকশন সোসাইটি (এমডব্লিউপিএস) এক বিবৃতিতে জানায়, স্থানীয় রেস্তোরাঁর সঙ্গে সমন্বয় করে প্রবাসী এই কর্মীদের এক সপ্তাহ দুই বেলা করে খাবার সরবরাহ করা হবে। এ ছাড়া তাঁদের জন্য একটি নিরাপদ আবাসনের খোঁজ করা হচ্ছে।

এমডব্লিউপিএসের বিবৃতিতে নিশ্চিত করা হয়, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনো কর্মী আহত হননি। ওই সময় তাঁরা কর্মক্ষেত্রে থাকায় বেঁচে গেছেন। তবে তাঁদের কাগজপত্র ও অন্যান্য জিনিস পুড়ে গেছে।

এমডব্লিউপিএসের চেয়ারপারসন মেরিত্তা দিয়াস বলেন, 'এক মাসের কম সময়ের মধ্যে মালকিয়াসহ তিনটি শ্রমিক ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। আমরা আশা করছি, আবাসনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সঙ্গে জড়িত কর্তৃপক্ষ এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে উদ্যোগ নেবে।'

মেরিত্তা দিয়াস বলেন, শ্রমিকদের পর্যাপ্ত মজুরি দেওয়া উচিত যাতে তাঁরা নিরাপদ বাড়ি ভাড়া করে থাকতে পারেন। তাঁদের জোর করে এমন ভবনে থাকতে বাধ্য করা উচিত নয়, যেটা জরাজীর্ণ। এ ছাড়া শ্রমিকদের আবাসনগুলো নিয়মিত পরিদর্শনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেই নিশ্চিত করতে হবে।

জুন মাসের মাঝামাঝি হামাদ টাউনের মালকিয়া এলাকায় অবস্থিত ওই শ্রমিক ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র, মালামাল ও টাকাপয়সা পুড়ে গেছে।

সূত্র : **ডিটি নিউজ**।

মা-বাবার জন্য এ শোক সহ্য করা বড় কঠিন

প্রথম আলো ডেস্ক

সন্দেহজনক একটি ঘটনায় একমাত্র শিশুসন্তানের প্রাণ গেছে। বাহরাইনের হিদ এলাকায় একটি মোটরগাড়ির ভেতরের ট্রাংকে তার লাশ পাওয়া গেছে। মিসরীয় ছেলেশিশুর শোকবিহ্বল বাবা এ ঘটনার বিচার চান।

নিহত ওই শিশুটির নাম ফেরাস মোহাম্মদ আহমেদ। এ ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে। ফেরাস গত ২৭ জুন রাতে নিখোঁজ হয়। তখন সে বাড়ির সামনে বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করছিল। পরের দিন সকালে পথচারীরা একটি গাড়ির ভেতর থেকে দুর্গন্ধ পেয়ে কৌতূহলী হয়। পরে সেখানে ফেরাসের লাশ পাওয়া যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

ফেরাসের বাবা ২৯ বছর বয়সী মোহাম্মদ আহমেদ একটি বিমা প্রতিষ্ঠানের কর্মী। তিনি বলেন, কী ঘটেছিল সেটা তাঁর পক্ষে আন্দাজ করা কঠিন। অথচ তদন্ত কর্মকর্তারা তাঁদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। গাড়িটির ভেতরের ট্রাংক তালাবদ্ধ ছিল। তিন বছর বয়সী ছেলেটি কীভাবে এর ভেতরে প্রবেশ করল? নিশ্চয়ই কেউ তাকে হত্যা করে লাশ সেখানে রেখেছে। আশা করি, অপরাধীকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেবে কর্তৃপক্ষ।

আহমেদ আরও বলেন, 'কেন আমার ছেলেটাকে মারল ওরা? জীবন তো সবে শুরু করেছিল সে। আর কয়েক মাস পরই তাকে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করার কথা ছিল। ও ছিল আমার একমাত্র আশা। আমি সব হারিয়েছি। আল্লাহ আমাকে একটা মানিক দিয়েছিলেন। আমি তার যত্ন-আত্তি করতাম। আজীবন সেটা করে যেতে পারতাম। সবকিছুরই কারণ থাকে। কিন্তু আমি যা হারিয়েছি, তা অমূল্য। আর কারও জীবনে যেন এমন ক্ষতি না হয়।'

আহমেদ আরও বলেন, 'ছেলের লাশ শনাক্ত করতে গিয়ে আমার বুকটা ভেঙে যায়। স্ত্রীর কাছে কী জবাব দিই আমি?'

কানু মসজিদে জানাজা শেষে ফেরাসকে সেন্ট্রাল মুহাররাক গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলর ইউসিফ আল তাওয়াদি বলেন, এ ঘটনায় সারা দেশে শোকের ছায়া নেমেছে। বেদনাদায়ক খবরটি সবাইকে ধাক্কা দিয়েছে। তারা এ হত্যার বিচার চান। সমস্ত ভিডিও ফুটেজ যাচাই করে দেখছে কর্তৃপক্ষ। দোষী প্রমাণ হলে অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি হবে।

সামাজিক যোগাযোগের অনলাইন মাধ্যম টুইটারে শত শত মানুষ 'হিদের শিশু নিখোঁজ' হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে ফেরাস হত্যার বিচারের দাবি জানাচ্ছেন।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

গাড়ির ট্রাংক থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা শিশু ফেরাস মোহাম্মদ আহমেদ ● সৌজন্যে **গালফ ডেইলি নিউজ**

মানামার গভর্নরের হুঁশিয়ারি

সড়কে গাড়ি বিক্রির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

প্রথম আলো ডেস্ক

ব্যবহৃত গাড়ি বিক্রির এক 'স্বর্গে' পরিণত হয়েছে বাহরাইনের রাজধানী মানামা। সময়ের সঙ্গে তা বেড়েই চলেছে। গাড়ির মালিকদের অবহেলার কারণেই তৈরি হচ্ছে এ অবস্থা। এতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানের পরিচ্ছন্ন ও নান্দনিক পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাই সড়কে ব্যবহৃত গাড়ি বিক্রি কমাতে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে ঠিকাদারদের ওপর নিয়ন্ত্রণও জোরদার করা হবে।

মানামার গভর্নর শেখ হিশাম বিন আবদুল রহমান আলখলিফা সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। গত ২৮ জুন রাজধানীর বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনে বের হয়ে গভর্নর হিশাম এসব কথা বলেন। এ সময় মানামার জেনারেল সেক্রেটারিয়েটের মহাপরিচালক শেখ মোহাম্মদ বিন আহমেদ আলখলিফা, মানামার সেক্রেটারিয়েট কাউন্সিলের প্রধান মোহাম্মদ আলখুজাই ও অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে কর্মকর্তারা জুফেয়ার এলাকায় বিক্রির জন্য সড়কের ওপর গাড়ি রাখার বিষয়টি স্বচক্ষে দেখেন। এ ছাড়া নিরাপত্তামূলক বেষ্টনী ছাড়াই নির্মাণাধীন ভবনগুলো ঘুরে দেখেন তাঁরা। বেষ্টনী না থাকায় এসব ভবনের নির্মাণ সামগ্রী সড়কের ওপর রাখায় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে।

যাঁরা ব্যবহৃত গাড়ি সড়কের ওপর বিক্রি করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে মানামার গভর্নরের কার্যালয় ও মানামার মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টা নেওয়া হবে বলে নিশ্চিত করেন শেখ হিশাম। জনগণকে ভালো সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো এবং এ ব্যাপারে আইনকানুন মেনে সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

মানামায় সড়কের পাশে বিক্রির জন্য গাড়ি রাখা হয়েছে ● সৌজন্যে **গালফ ডেইলি নিউজ**

বাহরাইনের আদালতে অভিযুক্ত একজনকে হাজির

চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে সম্ভ্রম বাঁচালেন তিন নারী

প্রথম আলো ডেস্ক

ধর্ষণ থেকে বাঁচতে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন থাইল্যান্ডের তিন নারী। এ ঘটনায় সম্প্রতি সন্দেহভাজন দুই অপহরণকারীর একজনকে বাহরাইনের একটি আদালতে হাজির করা হয়।

বাহরাইনের অপরাধসংক্রান্ত উচ্চ আদালত সূত্রে জানা যায়, বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে বাহরাইনি এক ব্যক্তি ও তাঁর সহযোগী ওই তিন নারীকে নিজেদের গাড়িতে উঠিয়েছিলেন। পরে বাড়ি হুরা এলাকায় না গিয়ে তাঁদের ইসা টাউন এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। একপর্যায়ে ধর্ষণ ও মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়।

এ অবস্থায় তিন নারীর একজন ঘটনা মুঠোফোনে পুলিশকে জানানোর চেষ্টা করেন। এতে একজন তাঁকে মারধর শুরু করেন। ছিনিয়ে নেন সবার মুঠোফোন। একসময় তিনজনই চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে গুরুতর আহত হন। তাঁদের বয়স ২৪, ৩৪ ও ৩৭ বছর।

ঘটনা প্রকাশের পর দুই অপহরণকারীর একজনকে গ্রেপ্তার করে অপহরণ, মারধর ও ছিনতাইয়ের অভিযোগে মামলা করা হয়। গত ২১ জুন আদালতে হাজির করা হয় তাঁকে। তবে তিনি এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অপর অপহরণকারী পলাতক।

আহত তিন নারীর একজন (২৪) কৌঁসুলিদের ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, দুই বান্ধবীকে নিয়ে তিনি জুফেয়ার এলাকার একটি ক্লাব থেকে বের হচ্ছিলেন। সেই সময় ওই ব্যক্তির সঙ্গে লিফটে তাঁদের দেখা হয়। সেখান থেকে বের হয়ে তাঁরা গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তখন খোয়াল করেন, একই লোক তাঁদের কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। পরে তিনি তাঁদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে তাঁর গাড়িতে উঠতে বলেন।

ভুক্তভোগী এই নারী বলেন, তাঁকে সদয় লোক বলে মনে হচ্ছিল। তাই তাঁর কথায় বান্ধবীদের নিয়ে গাড়িতে ওঠেন। গাড়ি ছাড়ার পর সন্দেহজনক আচরণ শুরু করেন চালক ওই ব্যক্তি ও তাঁর সহযোগী। এতে তিনি পুলিশকে ফোন করার চেষ্টা করেন। তখন একজন তাঁদের ওপর আক্রমণ করেন।

এই নারী আরও বলেন, বাহরাইনিদের মতো দেখতে লোকটি দ্রুত গাড়ি চালানোয় তাঁরা আরও বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। দেখেন, তাঁরা বাড়ি থেকে অনেক দূরে ইসা টাউনে। তিনি বলেন, 'আমরা অনুনয়-বিনয় করি বাড়িতে পৌঁছে দিতে। কিন্তু তাঁরা এতে কান দেননি। দ্রুত ৯৯৯ নম্বরে পুলিশি সহায়তার জন্য কল করলে অপহরণকারীদের একজন হাত থেকে মুঠোফোন কেড়ে নেন। বলেন, কাউকে ডাকলে মেরে ফেলবেন।'

আহত এই নারী বলেন, 'মেরে ফেলার হুমকির পর আমরা কাঁদতে শুরু করি। আমাদের মুঠোফোন ও পার্স তাঁদের হাতে তুলে দিতে বলা হয়। হুমকি দেওয়া হয় ধর্ষণের। এরই মধ্যে আমি আমার মুঠোফোন জামার নিচে লুকিয়ে ফেলি। পার্স হাতে দিয়ে বলি, ভেতরে মুঠোফোন আছে।' তিনি বলেন, 'গাড়ির ভেতর থেকে আমরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিলাম। কিন্তু বাইরের কেউ শুনতে পাচ্ছিলেন না। একসময় দরজা খুলতে পারি এবং চলন্ত গাড়ি থেকেই লাফ দিই। পরে আমার দুই বান্ধবীও লাফ দেয়।'

আদালতে বিবাদী দাবি করেন, গত ১০ মার্চের ওই ঘটনার কিছু তাঁর মনে নেই। কেননা, সেই সময় তিনি মাদকাসক্ত ছিলেন। গত ২৪ এপ্রিল বিদ্যুৎ-বিল পরিশোধ করতে গেলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আদালত সূত্র জানায়, পুলিশের উপস্থিতিতে তিন নারী গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে শনাক্ত করেছেন। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মামলার শুনানি মুলতবি করা হয়েছে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

সংক্ষেপ

ফেসবুক বন্ধুদের অন্য রকম উদ্যোগ

সিলেটের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা ফেসবুকে 'প্রত্যাশা ফাউন্ডেশন' নামের একটি ইভেন্ট খুলে অর্থ সংগ্রহ করে ১০০ পথশিশুকে ঈদের নতুন পোশাক দিয়েছেন। ১ জুন বিকেলে দক্ষিণ সুরমার চণ্ডীপুল এলাকার একটি কমিউনিটি সেন্টারে পথশিশুদের নিয়ে ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ঈদের পোশাক। নগরের ৭০ জন শিক্ষার্থী ফেসবুক ব্যবহারের সুবাদে একটি 'ইভেন্ট'-এর মাধ্যমে নিজেদের ও বন্ধুদের কাছ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা অর্থ সংগ্রহ করে। এক সপ্তাহ ঘুরে রেলস্টেশন, কাজীরবাজার সেতু, কিনব্রিজ, সুরমা নদীর চাঁদনি ঘাটের সিঁড়ি ও আলী আমজাদের ঘড়ি ঘরসহ আশপাশের এলাকা ঘুরে ১০০ শিশু তালিকাভুক্ত করা হয়। উদ্যোক্তারা বলেন, ২০১৪ সালে ঈদুল ফিতরে ৩০ জন পথশিশুর হাতে নতুন পোশাক কিনে দিয়ে এ কার্যক্রমের সূচনা হয়েছিল। এবার বড় পরিসরে 'প্রত্যাশা ফাউন্ডেশন' গঠন করে ৭০ জন উদ্যোগী তরুণের মাধ্যমে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা দিয়ে ১০০ জন পথশিশুকে ঈদের পোশাক দেওয়া হয়েছে।

● **নিজস্ব প্রতিবেদক,** সিলেট

গরমে কাজের

শেষ পৃষ্ঠার পর

কর্মসূচির সাফল্যের উল্লেখ করেছে শ্রম মন্ত্রণালয়।

এসএমসির দুর্ঘটনা ও জরুরি বিভাগের প্রধান আবাসিক চিকিৎসক পি ভি চেরিয়ান বলেন, মন্ত্রণালয় অত্যন্ত ভালো একটি কাজ করছে। তারা সব ভাষায় শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারপত্র বিলি করছে। এসবের মধ্যে লেখা আছে কীভাবে দাবদাহ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হয়, কী ধরনের পোশাক পরতে হয়, ঘন তরল খাবারের গুরুত্ব ও কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছায়ায় বসে বিশ্রাম নেওয়ার গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে।

চিকিৎসক চেরিয়ান আরও বলেন, বাহরাইনে যাঁরা নতুন শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে আসেন, তাঁদের সচেতন করার ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের ব্যক্তিগত খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-আশাক নিয়ে সচেতন করা হয়। একই কাপড় দীর্ঘক্ষণ পরে থাকলে অথবা চর্বিযুক্ত খাবার খেলে অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।

চলতি বছর গরমে অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা তুলনামূলক কম হলেও বাহরাইনি প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রম আইনের আওতায় দুপুর ১২টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বাইরে কাজ করানো বন্ধ রেখেছে। জুলাই ও আগস্ট মাসে এ নিয়ম চালু থাকবে। ২০০৭ সালে এটি প্রথম চালু হয়। এরপর থেকে হিটস্ট্রোকে শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা বন্ধ হয়েছে বলে জানান চেরিয়ান। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রচারের প্রভাবে আগের চেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠান এখন নিয়ম মানছে। এ বছর যে কজন রোগী পাওয়া গেছে তাঁদের সমস্যা হালকা—পানিশূন্যতা থেকে শুরু করে গায়ে ফুসকুড়ি ও মাংসপেশির টান ইত্যাদি। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিয়ে তাঁদের বাসায় পাঠানো হয়েছে। ওই আটজনের কারোরই হেড স্ট্রোক হয়নি, যাতে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ

২০১৫ সালেই সুইস ব্যাংকে জমা ৪৫০০ কোটি টাকা

শওকত হোসেন ●

■ বাংলাদেশিদের পাচার হওয়া অর্থের একাংশ যায় সুইস ব্যাংকে

■ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কমলেও বাংলাদেশ থেকে এক বছরে সুইস ব্যাংকে জমার পরিমাণ বেড়েছে ১০.৫০ শতাংশ

সারা দুনিয়া থেকে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোয় অর্থ গচ্ছিত রাখা কমলেও বাংলাদেশ থেকে তা বেড়েছে। এক বছরে এই বৃদ্ধির পরিমাণ সাড়ে ১০ শতাংশ। এর মানে, বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থের একাংশ সুইস ব্যাংকে গিয়ে জমা হচ্ছে।

২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে সুইস ব্যাংকগুলোতে রাখা অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৫ কোটি ৯২ লাখ ৫০ হাজার সুইস ফ্রাঁ, যা রূপান্তর করলে হয় ৪ হাজার ৫০৪ কোটি ১৯ লাখ ৯৫ হাজার টাকা। এই অর্থ সোনালী ব্যাংক থেকে হল-মার্ক গ্রুপের আত্মসাৎ করা অর্থের সমান।

সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক (এসএনবি) 'ব্যাংকস ইন সুইজারল্যান্ড ২০১৫' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন গত ৩০ জুন প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদনে অর্থ গচ্ছিত রাখার এই তথ্য পাওয়া গেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সুইস ব্যাংকে অর্থ রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গী পাকিস্তান। ভারতকেও ছাড়িয়ে গেছে পাকিস্তান। অথচ দুই বছর আগেও ভারত থেকে অর্থ পাচারের পরিমাণ ছিল দক্ষিণ এশিয়ায় সবার চেয়ে বেশি।

তথ্য অনুযায়ী, সুইস ব্যাংকগুলোয় বাংলাদেশিদের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ এক বছরের ব্যবধানে ১০ দশমিক ৫১ শতাংশ। অন্যদিকে পাকিস্তানের বেড়েছে ১৬ শতাংশ, ভারতের কমেছে ৩৩ শতাংশ। এর আগে ২০১৪ সাল শেষে সুইস ব্যাংকগুলোয় বাংলাদেশিদের ৫০ কোটি ৬০ লাখ ৪৭ হাজার সুইস ফ্রাঁ গচ্ছিত ছিল, যা প্রায় ৪ হাজার ৭৫ কোটি ৭০ লাখ ২৫ হাজার টাকার সমান।

এর আগে সুইস ব্যাংকগুলোতে কেবল বাংলাদেশি নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের অর্থই গচ্ছিত ছিল। তবে ২০১৫ সালেই প্রথম বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্পদ ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ রাখা হয়েছে। এর পরিমাণ ৮৪ লাখ সুইস ফ্রাঁ বা ৬৭ কোটি ৬৫ লাখ ৩৬ হাজার টাকা।

সুইস ব্যাংকগুলো গ্রাহকের তথ্যের বিষয়ে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখে। এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অবৈধ অর্থের বড় অংশই রাখা হয় সুইস ব্যাংকগুলোতে। তবে গত কয়েক বছর ধরে নানা ধরনের আন্তর্জাতিক চাপের কারণে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোও এখন আগের মতো কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করছে না। বরং গচ্ছিত অর্থের তথ্যাদির বিষয় কিছুটা শিথিল করেছে। ফলে সুইস ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ কমেছে। গতকাল প্রকাশিত প্রতিবেদনে ২০১৫ সালে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ১ শতাংশ কমেছে বলে জানানো হয়। অথচ বেড়েছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের।

যদিও সুইস ব্যাংকে গচ্ছিত সব টাকাই পাচার হওয়া অর্থ নয়। বিদেশে কর্মরত অনেক বাংলাদেশির বৈধ অর্থ সুইজারল্যান্ডে তাঁদের ব্যাংক হিসাবে জমা থাকে। তবে এর পরিমাণ কত তার কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয় না।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, সুইস ব্যাংকে অর্থ রাখার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় দেশকে বিশেষ বার্তা দিচ্ছে। সেটা হলো দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নেই, তাই টাকা পাচার হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন প্রতিবেদনের সূচকেও দেখা গেছে, এ দেশে ব্যবসার পরিবেশ অন্য দেশের তুলনায় খারাপ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কালোটাকা তৈরির সূত্রগুলো বন্ধ করতে হবে। এ ছাড়া যারা টাকা পাচার করেছে, তাদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সুইস ব্যাংকে সবচেয়ে বেশি অর্থ রাখা আছে যুক্তরাজ্যের। আর দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তান ৬৬তম, ভারত ৭০তম ও বাংলাদেশ ৮৮তম স্থানে। ২১১টি দেশ ও ভূখণ্ড নিয়ে এই তালিকা করা হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, মুদ্রা পাচারের মতো গুরুতর অপরাধ ঠেকাতে এনবিআর সক্রিয় আছে। এনবিআরে ইতিমধ্যে মুদ্রা পাচার রোধে বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছে। এ সেল বিভিন্ন সময়ে মুদ্রা পাচারসংক্রান্ত যত দেশি-বিদেশি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়, তা পর্যবেক্ষণ করছে। সেই অনুযায়ী নিজেরা তদন্ত করে থাকে। ইতিমধ্যে মুদ্রা পাচারসংক্রান্ত আইনটি সংশোধন করে এনবিআরকে তদন্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত এক দশকের মধ্যে মূলত ২০১২ সাল থেকে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থ রাখার পরিমাণ বেড়েই চলেছে। যেমন ২০১১ সালে ছিল ১৫ কোটি ২৩ লাখ ১১ হাজার কোটি সুইস ফ্রাঁ, পরের বছর তা বেড়ে হয় ২২ কোটি ৮৮ লাখ ৭৬ হাজার সুইস ফ্রাঁ। ২০১৩ সালে সুইস ব্যাংকে পাঠানো অর্থ আরও বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৭ কোটি ১৮ লাখ ৮০ হাজার সুইস ফ্রাঁ।

এ ছাড়া ২০০৬ সালে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের গচ্ছিত অর্থ ছিল ১২ কোটি ৪৩ লাখ ৪৬ হাজার সুইস ফ্রাঁ, ২০০৭ সালে ২৪ কোটি ৩০ লাখ ৮৯ হাজার সুইস ফ্রাঁ, ২০০৮ সালে বাংলাদেশিদের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ নেমে আসে ১০ কোটি ৭০ লাখ সুইস ফ্রাঁ, ২০০৯ সালে কিছুটা বেড়ে হয় ১৪ কোটি ৯১ লাখ সুইস ফ্রাঁ এবং ২০১০ সালে তা আরও বেড়ে হয় ২৩ কোটি ৫৫ লাখ ৯১ হাজার সুইস ফ্রাঁ। বর্তমানে সুইস ফ্রাঁয়ের বাজারদর ৮০ টাকা ৫৪ পয়সা।

এ বছর হাজিদের জন্য নিরাপত্তা ব্রেসলেট

প্রথম আলো ডেস্ক ●

চলতি বছর সৌদি আরবে পবিত্র হজ পালন করতে যাওয়া ব্যক্তিদের নিরাপত্তার জন্য হাতে একটি ব্রেসলেট পরতে হবে। গত বছর হজের সময় পদপিষ্ট হয়ে কয়েক হাজার হাজির মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সৌদি আরবের *আরব নিউজ* ও *সৌদি গেজেট* পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, এ আধুনিক প্রযুক্তি হাজিদের সহায়তা দেওয়া ও তাঁদের 'চিহ্নিত করতে' কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবে।

ব্রেসলেটগুলো পানি নিরোধক হবে বলে খবরে জানানো হয়েছে। জিপিএস ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত এসব ব্রেসলেটে হাজিদের নাম-ঠিকানা ও শারীরিক অবস্থার বিবরণসহ ব্যক্তিগত তথ্য থাকবে।

সৌদি গেজেট এ মাসেই খবর দেয়, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার আরেকটি উদ্যোগে মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদে আট শর বেশি নজরদারি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

বিদেশি কর্মকর্তাদের হিসাব অনুযায়ী, গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর হজের সময় মিনায় পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ২ হাজার ২৯৭ জন নিহত হন। হজের ইতিহাসে সেটাই ছিল সবচেয়ে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা। বিদেশি কর্মকর্তাদের কেউ কেউ তখন নিহত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে অসুবিধা হওয়ার কথা বলেছিলেন। সৌদি সরকারের দেওয়া হিসাবে, ওই দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ৭৬৯।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং হজ কমিটির চেয়ারম্যান যুবরাজ মোহাম্মদ বিন নায়েফ ঘটনার পরপরই এ বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন। তবে তদন্তের ফল এখনো প্রকাশ করা হয়নি। সূত্র : **এএফপি**

জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

সন্ত্রাসীদের শিকড় অবশ্যই খুঁজে বের করব : প্রধানমন্ত্রী

প্রথম আলো ডেস্ক ●

শেখ হাসিনা

রাজধানীর গুলশানে রেস্তোরাঁয় জঙ্গি হামলার ঘটনাকে 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক' বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, পরিকল্পিত এই হামলার জন্য যারা সন্ত্রাসীদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করেছে, তাদের শিকড় অবশ্যই খুঁজে বের করা হবে। সন্ত্রাসীরা এর আগে গুপ্তহত্যা চালিয়েছে এবং পুরোহিত, ফাদার ও ভিক্ষুদের টার্গেট করেছে। অপরাধে জড়িত অনেক সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সিইজি কিহারা ৩ জুলাই সকালে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

বৈঠকে বাংলাদেশ ও জাপান ঐক্যবদ্ধভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে বলে একমত প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী ও জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান ও ভারতে সন্ত্রাসী হামলার কথা উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গুলশানে হামলায় নিহত জাপানি নাগরিকদের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হবে। দক্ষতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান জাপানের প্রতিমন্ত্রী। তিনি বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, পারস্পরিক স্বার্থে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ এবং বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত মাসাতো ওয়াতানাবে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তুললে জঙ্গিবাদ থামবে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মানুষ রুখে দাঁড়ালে এ দেশে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ কোনো স্থান পাবে না। ২ জুলাই ঢাকা-চট্টগ্রাম ও জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ চার লেনের জাতীয় মহাসড়কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

বার্তা সংস্থা বাসসের খবরে বলা হয়, রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বোতাম টিপে দুই মহাসড়কের চার লেন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। বক্তব্যে সন্ত্রাস প্রতিরোধে সাহস নিয়ে এগিয়ে আসতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তুললে কিন্তু এটা থামবে। ঠিক যেমনটি মাদারীপুরে হয়েছে। একজন অধ্যাপককে হত্যাচেষ্টা জনগণ ঠেকিয়ে দিয়ে সন্ত্রাসীকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। কাজেই এভাবে সবাইকে সাহস নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।'

ফাহিমের জন্য খালেদার মায়াকান্না কেন? : সম্প্রতি 'ক্রসফায়ারে' নিহত ফাহিম সম্পর্কে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বক্তব্যের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মাদারীপুরে একজন কলেজশিক্ষককে হত্যার জন্য আঘাত করা হলো। যে লোকটা একজন কলেজশিক্ষককে মারতে গিয়ে জনগণের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ল, তার জন্য খালেদা জিয়ার এত মায়াকান্না কেন?

২৯ জুন জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা অনেক আগেই সন্দেহ করেছিলাম হঠাৎ গুপ্তহত্যা কেন? মাদারীপুরের জনগণ সাহসের সঙ্গে কলেজশিক্ষকের ওপর আঘাতকারীকে ধরে ফেলল। পরে তাকে নিয়ে আরও লোকজন ধরতে গেলে সে ক্রসফায়ারে বা যেকোনো কারণে হোক মৃত্যুবরণ করেছে। তার জন্য খালেদা জিয়ার এত মায়াকান্না কেন, এটা আমার প্রশ্ন? তার মানে হাঁড়ির ভাত সেদ্ধ হচ্ছে কি না, তা একটা টিপলেই বোঝা যায়। এ থেকেই বোঝা যায় গুপ্তহত্যার সঙ্গে তাঁদের একটা সম্পর্ক রয়েছে। প্রকাশ্যে মানুষ পুড়িয়ে তারা জনগণের রুদ্ররোষের শিকার হয়েছে। এখন গুপ্তহত্যা ঘটিয়ে তারা দেশে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে। তিনি বলেন, 'এ ধরনের হত্যাকাণ্ড যারাই ঘটাবে, তার বিরুদ্ধে অবশ্যই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনগণের নিরাপত্তা দেওয়া আমাদের দায়িত্ব এবং আমরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন।'

শেখ হাসিনা খালেদা জিয়ার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'রমজানের দিনে আমরা ইফতার অনুষ্ঠানে গিয়ে আল্লাহ এবং রাসুল (সা.)-এর নাম নিই। আর তিনি ইফতারে গিয়ে প্রতিদিন নতুন নতুন গিবত গাওয়া, মানুষের বদনাম করা আর অসত্য কথা বলেন। এটাই হচ্ছে তাঁর চরিত্র। এর বেশি আমি বলতে চাই না। জনগণ এর বিচার করবে।'

মোড়া আধুনিক যুগে বসার জন্য আসবাবের ধরনে নানা পরিবর্তন এলেও এখনো বেত আর বাঁশের তৈরি মোড়ার চাহিদা রয়েছে বেশ। বাসাবাড়িতে বসার জন্য এই মোড়া এখনো অনেকের কাছে পছন্দের। দেশের সিলেট অঞ্চলের তৈরি মোড়ার সুনাম রয়েছে সারা দেশে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীরা সিলেটে আসেন মোড়া কিনতে। পাইকারদের কাছে বিক্রির জন্য রিকশাভ্যানে করে সিলেট নগরে মোড়া নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। ১ জুলাই সিলেট নগরের কদমতলী এলাকা থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়া

এই হত্যালীলা থামাতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

খালেদা জিয়া

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বলেছেন, 'কে ক্ষমতায় থাকবে, কে ক্ষমতায় যাবে, সেটা আজ বড় কথা নয়। কোনো অর্জনই টিকবে না, যদি আমরা সন্ত্রাস দমন করতে না পারি।' তিনি বলেন, এই আতঙ্ক, এই হত্যালীলা থামাতে হবে।

৩ জুলাই বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়া এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রিয় মাতৃভূমি আজ সন্ত্রাসের বিষাক্ত ছোবলে জর্জরিত। এটা এ দেশের জন্য নতুন এক ভয়াবহ জাতীয় সংকট।

১ জুলাই রাতে গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরাঁয় দেশি-বিদেশি অতিথিদের জিম্মি করে নারকীয় হত্যার ঘটনায় খালেদা জিয়া এ সংবাদ সম্মেলন করেন। এর আগে তিনি দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যদের জরুরি বৈঠক ডাকেন।

সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়া কোনো প্রশ্ন নেননি। একের পর এক হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'আজ এখানেই থাক, আরেক দিন উত্তর দেব। আশা করি আপনারা আমার এ বক্তব্য ভালোভাবে প্রকাশ করবেন।'

খালেদা জিয়া বলেন, 'আজ আমরা যারা আছি, ভবিষ্যতে তারা কেউ হয়তো থাকব না। দেশ থাকবে, জাতি থাকবে। সেই দেশ-জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আজ বিপন্ন। আমরা যে যাই বলি, আমাদের কিছুই থাকবে না, কোনো অর্জনই টিকবে না, যদি আমরা সন্ত্রাস দমন করতে না পারি, জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারি। তাই কালবিলম্ব না করে আসুন, সব ভেদাভেদ ভুলে দলমত-নির্বিশেষে সন্ত্রাসবিরোধী ঐক্যের মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।'

হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁর ঘটনার কথা উল্লেখ করে বিএনপির চেয়ারপারসন বলেন, শুধু শুক্রবার রাতের ঘটনাই নয়। সারা বাংলাদেশ আজ সন্ত্রাসের থাবায় ক্ষতবিক্ষত। মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন, মন্দিরের পুরোহিত, ধর্মগুরু ও যাজক, ভিন্নমতের লেখক প্রকাশক-ব্লগার, খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে সযত্নে লালিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য। কোথাও কেউ নিরাপদ নয়। এই আতঙ্ক, এই হত্যালীলা থামাতে হবে। বন্ধ করতে হবে রক্তপাত। সবাইকে একতাবদ্ধ হতেই হবে। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রহীন দেশে স্বৈরাচারী শাসন, অসহিষ্ণু রাজনীতি, দমন-পীড়নের রাষ্ট্রব্যবস্থা, অধিকারহীন সমাজ, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য-বঞ্চনা এবং সুশিক্ষার অভাব ক্রমাগত চলতে থাকলে সেখানে সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপের মাধ্যমে এই কারণগুলো দূর না করলে সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা যায় না। জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া এ ধরনের জাতীয় সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। কেবল গণতান্ত্রিক পরিবেশেই জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হতে পারে।

খালেদা জিয়া বলেন, 'বর্তমানে সন্ত্রাসের যে চিত্র দেখছি, সেটা নিছক আইনশৃঙ্খলাজনিত মামুলি কোনো সমস্যা নয়। কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান দিয়ে এই সন্ত্রাস মোকাবিলা করা যাবে না। এই সংকটের শিকড় আরও অনেক গভীরে।' তিনি বলেন, 'সন্ত্রাস দমন কার্যক্রমকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে গেলে এই সংকট আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। এই বিষয়টির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'

দেশি-বিদেশি ২০ নিরপরাধ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনার উল্লেখ করে খালেদা জিয়া বলেন, কোনো সুস্থ ও বিবেকবান মানুষ এ ধরনের কাপুরুষোচিত হামলা ও নিরপরাধ মানুষের হত্যাযজ্ঞকে মেনে নিতে পারে না। এমন অযৌক্তিক, নিষ্ঠুর, হঠকারী ও ভুল পথে কোনো কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়। কোনো আদর্শ কিংবা ধর্মই এ ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অনুমোদন করে না।

উপর্যুপরি সন্ত্রাসী হামলা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনার উল্লেখ করে বিএনপির চেয়ারপারসন বলেন, 'এটা আমাদের জন্য নতুন এক ভয়াবহ জাতীয় সংকট। সকলের মিলিত প্রয়াসে আমাদের এ সংকট মোকাবিলা করতে হবে।'

খালেদা জাতীয় জীবনের এই সংকটে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, অগ্নিনির্বাপক দলসহ অভিযানে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মওদুদ আহমদ, জমির উদ্দিন সরকার, আ স ম হান্নান শাহ, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ও রফিকুল ইসলাম মিয়া।

ওরা বিপথগামী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রোহানের খালা জেসমিন আক্তার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে রোহান নিখোঁজ ছিল। তার সন্ধান চেয়ে পুলিশ, র‍্যাব এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেও গিয়েছি আমরা। কেউ তার সন্ধান দিতে পারেনি।' তিনি বলেন, 'আমরা শুধু জানতে চাই, সরকার কেন আমাদের নিখোঁজ ছেলেকে বের করতে পারল না।'

মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামাল উদ্দীন মীর *প্রথম আলোকে* বলেন, রোহান নিখোঁজ হয়েছেন উল্লেখ করে গত ৪ জানুয়ারি থানায় জিডি করা হয়েছিল। জিডিতে বলা হয়, ৩০ ডিসেম্বর বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে রোহান আর বাসায় ফেরেনি। পরে তদন্তে দেখা যায়, রোহান জঙ্গি কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছেন। এরপর তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলে, যাতে দেশের বাইরে না যেতে পারেন, সে জন্য বিমানবন্দরেও জানানো হয়েছিল।

মোবাশ্বের : গত ২৯ ফেব্রুয়ারি কোচিংয়ে যাওয়ার কথা বলে মীর সামেহ মোবাশ্বের বনানীর ডিওএইচএসের বাসা থেকে বের হয়ে আর ফেরেননি। ৩ জুলাই ওই বাসায় তাঁর বাবা মীর এ হায়াৎ কবিরের সঙ্গে *প্রথম আলোর* কথা হয়। তিনি বলেন, সামেহ স্কলাস্টিকা স্কুল থেকে ও লেভেল পাস করেছে। এ লেভেল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। যেদিন সামেহ নিখোঁজ হয়, সেদিন তার গুলশানের আজাদ মসজিদের পাশের একটি কোচিং সেন্টারে যাওয়ার কথা ছিল।

বাবা মীর এ হায়াৎ কবির একটি টেলিকম প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে চাকরি করেন। মা একটি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক।

হায়াৎ কবির *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মোবাশ্বের বোধ-বুদ্ধিতে কিছুটা পিছিয়ে ছিল। আমার মন বলছিল ও কারও খপ্পরে পড়েছে। আজ আমারটা নিয়েছে, কাল আর কারও কপাল আমার মতো হবে। এটা তো একটা জাতীয় দুর্যোগ।' তিনি বলেন, 'মোবাশ্বের নিখোঁজ হওয়ার পরে সেখানকার ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, গুলশানের আগোরার পাশে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে সে একটি রিকশায় করে বনানী ১১ নম্বরের দিকে যাচ্ছে। এরপর মুঠোফোনে বা অন্য কোনো মাধ্যমে সে পরিবারের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।'

নিবরাস : মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালয়েশিয়া ক্যাম্পাসের ছাত্র ছিলেন নিবরাস ইসলাম। ব্যবসায়ী নজরুল ইসলামের এক ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে নিবরাস বড়। বাসা ঢাকার উত্তরায়। তাঁর নিকটাত্মীয়রা সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পদে চাকরি করেন। পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, নিবরাস যে মালয়েশিয়া থেকে ঢাকায় এসেছিলেন, তা-ই জানত না পরিবার।

খায়রুল : পুলিশ কর্মকর্তারা জানান, ছয়-সাত মাস ধরে উত্তরবঙ্গের অন্তত তিনটি হত্যাকাণ্ডে খায়রুল ইসলামের নাম এসেছে। তাঁকে তখন থেকেই খোঁজা হচ্ছিল। খায়রুল যে গুলশানে হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে পুলিশ মোটামুটি নিশ্চিত।

প্রথম আলোর **বগুড়া প্রতিনিধি** জানান, বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার চুতিনগর ইউনিয়নের ব্রিকুষ্টিয়া গ্রামের দিনমজুর আবু হোসেনের দুই মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে খায়রুল বড়। ব্রিকুষ্টিয়া দারুল হাদিস সালাদিয়া কওমি মাদ্রাসায় কিছুদিন পড়েছিলেন খায়রুল। এরপর ডিহিগ্রাম ডিইউ সেন্ট্রাল ফাজিল মাদ্রাসা থেকে তিনি দাখিল পাস করেন বলে প্রতিবেশীরা জানান।

খায়রুলের মা পেয়ারা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, এক বছর ধরে খায়রুল নিখোঁজ ছিল। স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে হারানো বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার জন্য আট-নয় মাস আগে গিয়েছিলেন বাবা-মা। কিন্তু থানায় জিডি করতে হবে শুনে তাঁরা আর বিজ্ঞপ্তি দেননি।

চুতিনগর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য শাহজাহান আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, গণমাধ্যমে ছবি দেখেই বাবা-মা ও প্রতিবেশীরা খায়রুলকে চিনতে পারেন। গ্রামে জানাজানি হয়। ৩ জুলাই পুলিশ একটি ছবি নিয়ে বাড়িতে আসে। তাঁর বাবা-মা প্রথমে ছবিটি চিনতে পারছেন না বলে পুলিশকে জানান। পরে পুলিশ কর্মকর্তারা খায়রুলের ছবি দেখতে চাইলে বিষয়টি বেরিয়ে আসে। পুলিশ খায়রুলের মা-বাবাকে আটক করেছে।

ঢাকা মহানগর ডিবির একজন কর্মকর্তা গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, ঢাকার অভিজাত এলাকায় বসে কেউ একজন এই হামলার সমন্বয় ও পরিকল্পনা করেছেন বলে তাঁরা মনে করছেন। যার কারণে বগুড়ার নিম্নবিত্ত পরিবারের একজন মাদ্রাসাছাত্রের সঙ্গে ঢাকার অভিজাত পরিবারের চারটি ছেলের যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে।

যেভাবে জঙ্গি হামলা : গুলশানের রেস্তোরাঁয় জঙ্গি হামলার ঘটনায় দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা পাওয়া গেছে। তাঁদের একজন 'হলি আর্টিজান বেকারি' নামের ওই রেস্তোরাঁর সুমন হক। হামলার সময় তিনি ভেতরে ছিলেন। বেরিয়ে আসার পর সুমন *প্রথম আলোকে* বলেন, রাত ৮টা ৪৫ মিনিটের দিকে ৮-১০ জন যুবক অতর্কিতে ঢুকে পড়ে। তাদের একজনের হাতে খোলা তলোয়ার ছিল, অন্যদের হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। ঢুকেই ওরা ফাঁকা গুলি করে।

সুমন বলেন, 'আমি ছাদে ছিলাম। ওরা যখন বোমা মারছিল, তখন বিল্ডিং কাঁপছিল। ওরা ১০-১২টা বোমা মেরেছে। ওরা সামনের দিকে স্টেপ নিচ্ছিল মনে হচ্ছিল। তখন ছাদ থেকে লাফ দেই।' তিনি বলেন, আক্রমণকারীদের বয়স সর্বোচ্চ ২৮ বছর বলে মনে হয়েছে। গুলি ছোড়ার সময় তারা 'আল্লাহু আকবর' স্লোগান দেয়।

রাত ১২টার দিকে মুঠোফোনে আর্টিজান বেকারির পাশের লেকভিউ ক্লিনিকের কর্মচারী বিজয় ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, হঠাৎ করে তাঁরা রেস্তোরাঁর ভেতর থেকে গুলির শব্দ শোনেন। এরপর হামলা শুরু হয়। পুলিশ সদস্যরা সামনে এগোতে চাইলে সন্ত্রাসীরা গুলি ও বোমা ছোড়ে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কেউ ভেতরে ঢুকতে পারছিলেন না।

অভিযানের ভিডিও : ওই রেস্তোরাঁর কাছাকাছি একটি ভবন থেকে একজন বিদেশি কিছু ভিডিও করে ফেসবুকে দেন। একটি ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, ভোরবেলায় চারজন নারী, তিনজন পুরুষ ও একটি শিশু রেস্তোরাঁর সামনের চত্বর দিয়ে হেঁটে বের হয়ে যাচ্ছেন। এঁদের ছেড়ে দেওয়ার পর ছাই রঙের গেঞ্জি পরিহিত পিস্তল হাতে একজনকে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখা যায়। ভেতরে একটি টেবিলের পাশে দুজন বসে আছেন। দুটি ক্লিপে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের সমন্বিত অভিযানের কিছু দৃশ্য আছে। তাতে দেখা যায়, সেনাবাহিনীর দুটি সাঁজোয়া যান সজোরে রেস্তোরাঁর নিচতলার দেয়ালে আঘাত করে তা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। আরেক ক্লিপে পাঁচজন সেনাসদস্য ভবনের ভেতরে বোমাজাতীয় কিছু একটা ছুড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সারিবদ্ধ অবস্থানে থেকে অস্ত্র নিয়ে ভেতরে ঢোকেন। এ সময় অনেক গুলির শব্দও শোনা যাচ্ছিল।

দুই দিনের শোক পালন : এখনো শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি জাতি। সরকার দুই দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। ৩ ও ৪ জুলাই ঢাকাসহ সারা দেশের অফিস-আদালতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকেই নিজের প্রোফাইল ছবিতে কালো ব্যাজ যুক্ত করেছেন। দেশের বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, গির্জাসহ ধর্মীয় উপাসনালয়ে দোয়া ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস ও কূটনৈতিক মিশনগুলোতেও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

নিহতদের শ্রদ্ধায় ফুল : গুলশান এলাকার ৭৯ নম্বর সড়কের প্রবেশমুখে ছিল পুলিশের ব্যারিকেড। বাঁ পাশে ব্যারিকেড ঘেঁষে ফুলের তোড়াগুলো। এই সড়কের হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরাঁয় জঙ্গি হামলায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এই তোড়াগুলো রেখে গেছেন তাঁদের বন্ধু, স্বজন ও সাধারণ মানুষ। তাঁরা সবাই ছিলেন শোকাহত, মৌন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছেন অনেকে। তারপর নীরবেই চলে গেছেন।

ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর মুক্তিযোদ্ধা আক্কু চৌধুরী বলেন, 'বলার কিছু নেই। মনে হচ্ছে একাত্তরে ফিরে গেছি। ধর্মের নামে বিকৃতি, ধর্মের নামে খুনোখুনি বন্ধ করতে হবে।'

চিত্রশিল্পী মনিরুজ্জামান বলেন, 'ভীষণভাবে শোকাহত। যারা এখানে নিহত হয়েছে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। এই শোক আমরা বয়ে বেড়াব।'

ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন নিহত বিদেশি নাগরিকদের কয়েকজনের স্বজন। ফুল দেওয়ার পর নীরবে চোখের জল ফেলতে দেখা গেছে তাঁদের। কিন্তু সংবাদমাধ্যমে তাঁরা কোনো কথা বলতে রাজি হননি।

অবিশ্বাস্য মিল!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গত ৩০ জুন দুপুরে বিমানবন্দর থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্তাদের ঘেরাটোপ থেকে সনুর মা মুমতাজ ও বাবা মেহবুব সটান চলে এলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের অফিসে। মুমতাজ সেই মুহূর্তটুকু বর্ণনা করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। *প্রথম আলোকে* বললেন, 'উনিও তো মা। সনুকে দেখেই বুকে টেনে নিয়ে তিনি আমাকে বললেন, আমার কথা আমি রেখেছি। আপনার খালি কোল ভরে দিয়েছি এটাই আমার প্রাপ্তি।'

সুষমাকে মুমতাজ দুটি অনুরোধ করেছেন। প্রথম অনুরোধ বাংলাদেশের জামাল ইবনে মুসা, এই কাহিনির যিনি 'বজরঙ্গি ভাইজান', যাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশে এখনো মামলা চলছে, তাঁর যেন কোনো শাস্তি না হয়। ভারত সরকার যেন জামাল ভাইয়ের পাশে থাকে। আর দ্বিতীয় অনুরোধ, সনু যাতে লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারে সেটা যেন একটু দেখেন।

মুমতাজ-মেহবুব মনে মনে একটা কামনাও করছেন। রহিমা নামের যে বউটা পাঁচ মাসের মেয়ে কোলে তাঁদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল, যাকে মুমতাজ মাস কয়েক পর দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, প্রতিশোধ নিতে যে ছয় বছরের সনুকে চুরি করে বাংলাদেশে বেচে দেয়, তার যেন শাস্তি হয়।

নিউ সীমাপুরিতে এবার আগেভাগেই চলে এসেছে খুশির ঈদ। গলিতে গলিতে সেই খুশির ঝলকানি। খুশির ঝলক বিহ্বলিত সনুর চোখেও। মায়ের গলা জড়িয়ে শুধু বলল, মাকে পেয়ে খুব ভালো লাগছে।

খুশি বাংলাদেশি 'বজরঙ্গি' : সনু তার বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছার খবরে পেয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন 'বাংলাদেশি বজরঙ্গি ভাইজান' খ্যাতি পাওয়া বরগুনার জামাল ইবনে মুসা। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ ছোট্ট একটা ভিনদেশি শিশুকে ওর বাবা-মায়ের হাতে তুলে দিতে ভূমিকা রাখতে পেরেছি, এর চেয়ে বড় পাওয়া আমার জীবনে আর কী থাকতে পারে। ঈদের আগে ওর পরিবারকে এমন একটা উপহার দিতে পেরে আমি খুশি।'

সনুকে উদ্ধার, দেশে পাঠানোর জন্য সংগ্রামের দিনগুলোর কথা স্মরণ করে জামাল ইবনে মুসা বলেন, 'গত দেড় বছরে থানা-পুলিশ, আদালত, সমাজ যেখানেই ছেলেটির জন্য সহায়তা ভিক্ষা করেছি, সেখানেই লাঞ্ছনা, অপমান, অপবাদ ছাড়া কিছুই পাইনি। নিজের জীবিকার অবলম্বন ঢাকার একটি বেসরকারি কোম্পানির চাকরিটিও আমাকে হারাতে হয়েছে।'

জামাল ইবনে মুসা আক্ষেপ করে বলেন, 'এতটুকু একটা বাচ্চাকে যারা অপহরণ করে ছয় বছর নিজেদের কাছে রেখে দুর্বিষহ কষ্ট ও নির্যাতন করল, আমি তাদের বিচার চাই। এখনো তারা নির্বিঘ্নে এলাকায় ঘুরছে।'

পাকিস্তানি একটি শিশুকে ভারতীয় এক যুবকের অনেক দুর্ভোগ সহ্য করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার গল্প নিয়ে বলিউডের সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র বজরঙ্গি ভাইজান বেশ জনপ্রিয়তা পায়। বাংলাদেশের জামাল এমনই এক উদ্ধারের চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়ে 'বাংলাদেশের বজরঙ্গি' নামে পরিচিতি পান।

ঢাকায় সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা কাতারের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১২ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা শেষে ২ জুলাই সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে সাঁজোয়া যান নিয়ে দেয়াল গুঁড়িয়ে রেস্তোরাঁর ভেতরে ঢুকে পড়েন সেনা কমান্ডোরা। শুরু হয় 'অপারেশন থান্ডারবোল্ট'। প্রচণ্ড গোলাগুলিতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে গুলশান এলাকা। ১৩ মিনিটের মধ্যে সাত সন্ত্রাসীকে কাবু করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন কমান্ডোরা। জীবিত উদ্ধার করেন ১৩ জিম্মিকে। ৫০ মিনিট পর অভিযান সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

জিম্মিমুক্তির অভিযান নিয়ে নানা প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক

১ জুলাই হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় জঙ্গি হামলা এবং জিম্মি সংকটের সমাধান আরও দ্রুত করা কি সম্ভব ছিল? সেখানে কমান্ডোরা কি আরও আগে অভিযান চালাতে পারতেন? ঝটিকা অভিযান আরও আগে চালালে হতাহতের সংখ্যা কি কমানো যেত? এসব প্রশ্নই এখন ঘুরেফিরে সবার মনে আসছে। গত শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে পুলিশপ্রধানের (আইজি) গাড়ির গতি রোধ করে একজন বাবা তাঁর মেয়ের খবর জানতে চেয়েছিলেন। জিম্মি হয়ে ছিলেন এ রকম আরও অনেকের স্বজনেরা বেদনাভরা বুক নিয়ে যখন ঘরে ফিরেছেন, তাঁদের মনে ওই প্রশ্নগুলো বারবার ফিরে এসেছে। এখনো তাঁরা এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজছেন।

জিম্মি সংকটের বিস্তারিত, হতাহতদের সংখ্যা ও পরিচয় এবং হামলাকারীদের বিষয়ে আমরা প্রথম ও একমাত্র যে সরকারি ভাষ্য পাই, সেটি হচ্ছে আন্তবাহিনী গণসংযোগ অধিদপ্তর আয়োজিত শনিবার দুপুরের সংবাদ সম্মেলন। কোনো প্রশ্নের সুযোগ না থাকায় একটি লিখিত বিবৃতির বাইরে আর কোনো তথ্য এখনো সরকারিভাবে প্রকাশ করা হয়নি।

কর্তৃপক্ষীয় ভাষ্য বলছে, '১ জুলাই রাত প্রায় পৌণে নয়টায় রাজধানীর গুলশান-২ এর রোড নং ৭৯স্থ হলি আর্টিজান বেকারী নামক একটি রেষ্টুরেন্টে দুষ্কৃতিকারীরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রবেশ করে এবং রেষ্টুরেন্টের সকলকে জিম্মি করে।' ওই বিবরণ অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডোর নেতৃত্বে কমান্ডো অভিযানের মাধ্যমে শনিবার সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে অপারেশন শুরু হয় এবং ৮টা ৩০ মিনিটে তার সফল সমাপ্তি ঘটে। জিম্মি পরিস্থিতি নিরসনের অভিযান পরিচালনার আগের প্রায় ১২ ঘণ্টায় কী কী ঘটেছে, তার একটা ধারণা অবশ্য বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সম্প্রচার ও প্রকাশিত সংবাদ থেকে পাওয়া যায়।

হামলার গোড়ার দিকে সেখানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ একটি উদ্যোগ নেয় এবং ঘটনার গুরুত্ব বুঝে ওঠার আগেই তাঁদের দুজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা—রবিউল করিম ও সালাউদ্দিন নিহত হন। আহত হন আরও ৩৫ সদস্য। পুলিশের এই প্রাথমিক সাড়ায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নও (র‍্যাব) শরিক ছিল এবং তাদেরও কয়েকজন আহত হন।

টেলিভিশন চ্যানেলগুলো ঘটনাস্থল থেকে এগুলো সরাসরি সম্প্রচার করতে থাকার একপর্যায়ে র‍্যাবের মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ ওই এলাকায় নিরাপত্তাবেষ্টনী মেনে চলার এবং সরাসরি সম্প্রচার বন্ধের আহ্বান জানান। তবে সম্প্রচারগুলোতে পুলিশ ও র‍্যাবের কোনো কোনো সদস্যের আচরণে স্পষ্টতই পেশাদারত্বের অভাব দেখা গেছে। ফ্ল্যাপজ্যাকেট ও হেলমেট না পরে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে যাওয়া জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোন ধরনের প্রস্তুতির চিত্র তুলে ধরে কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই তা ভেবে দেখবে।

বেনজীর আহমেদ একই সময়ে শান্তির্পূণভাবে সংকট নিরসনের লক্ষ্যে হামলাকারীদের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করেন। জিম্মিদের মুক্ত করার লক্ষ্যে জঙ্গিদের সঙ্গে আলোচনা শুরু এবং নানা ধরনের শর্তের বিষয়ে নানান গুজব রটলেও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নিশ্চিত করা হয় যে কোনো ধরনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, যেখানে আলোচনা শুরুই হয়নি, সেখানে কেন জিম্মিমুক্তির অভিযানে প্রায় ১২ ঘণ্টা অপেক্ষা করা হলো? আলোচনার মাধ্যমে জিম্মিদের মুক্ত করার কোনো দৃষ্টান্ত বা অভিজ্ঞতা কি আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর বর্তমান নেতৃত্বের আছে? তাহলে সময় অপচয়ের ব্যাখ্যা কী?

এ ধরনের অভিযানে প্রাণহানি, বিশেষ করে জিম্মিদের জন্য ঝুঁকিটা অনেক বেশি। আবার জিম্মিদের মধ্যে বিদেশিদের সংখ্যাধিক্য থাকার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, সেই সিদ্ধান্ত নিতেই কি কালক্ষেপণ হলো?

হামলাকারী ও নিহতরা

রাজধানীর গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরাঁয় জিম্মিদের মধ্যে গত শুক্রবার রাতেই ২০ জনকে হত্যা করা হয়

যাঁরা নিহত হলেন

বাংলাদেশি*

ফারাজ হোসেন

অবিন্তা কবীর

ইশরাত আখন্দ

ভারতীয়

তারুশি জৈন

জাপানি

তানাকা হিরোশি

সাকাই ইউকু

কুরুসাকি নুবুহিরি

জাপানি

ওকামুরা মাকাতো

শিমুধুইরা রুই

হাসিমাতো হিদেকো

কোয়ো ওগাসাওয়ারা

ইতালীয়**

আদেলে পুলিজি

ক্লাউদিয়া দান্তোনা

ক্রিস্তিয়ান রসি

ইতালীয়**

মার্কো তোন্দাৎ

নাদিয়া বেনেদিত্তি

সিমোনা মন্তি

ক্লাউদিয় কাপেল্লি

মারিয়া রিবোলি

ভিনচেনসো দালেস্ত্রো

* নিহত ৩ বাংলাদেশির মধ্যে এক জন বাংলাদেশি আমেরিকান
** ইতালীয় নাগরিকদের ছবি নেওয়া হয়েছে *লা রেপুবলিকা* পত্রিকার অনলাইন থেকে

নিহত ৬ জঙ্গির ৫ জন

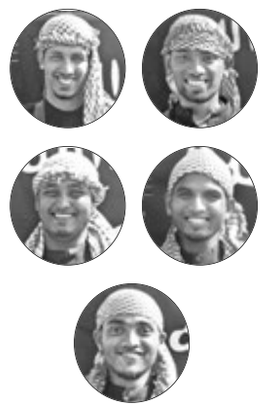

আইএসের বার্তা সংস্থা আমাক থেকে নেওয়া ছবিগুলো প্রকাশ করেছে সাইট ইন্টেলিজেন্স

'মেয়েকে জীবিত পাব ভাবতেই পারিনি'

নিজস্ব প্রতিবেদক

এ কে বোরহান উদ্দীন বলছিলেন, 'মেয়ে জীবিত, তা ভাবতেই পারিনি। শনিবার সকালে মেয়ে জানায়, সে জীবিত আছে। শুক্রবার রাতে ঘটনা জানার পর সারাক্ষণ দোয়া করেছি। শুধু বলেছি, সবকিছুর বিনিময়ে হলেও আমার মেয়ে ও অন্যরা যেন জীবিত থাকে। মসজিদে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করেছি। ভাবতেই পারিনি মেয়েকে ফেরত পাব।'

বোরহান উদ্দীন ২০ বছর বয়সী ফাইরুজ মালিহার বাবা। রাজধানীর গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরাঁয় জঙ্গিরা যাঁদের জিম্মি করে, মালিহা তাঁদের একজন। গোলাগুলির শুরুতেই মালিহা ফোন করে বলতে পেরেছিলেন তাঁদের জিম্মি করার কথা। তারপর ঘটনাস্থলে গিয়ে এই বাবা একটার পর একটা ঘটনা শুনছিলেন। জঙ্গিদের অতর্কিত বোমা হামলায় শুরুতেই নিহত হন পুলিশের দুই কর্মকর্তা। রাতভর জিম্মি উদ্ধারের প্রস্তুতি। সকালে যৌথ বাহিনীর কমান্ডো অভিযানে ২০ জিম্মির লাশ উদ্ধার। এই বাবা ধরেই নিয়েছিলেন যা হওয়ার তাই হয়েছে।

৩ জুলাই বিকেল পর্যন্ত মেয়ের সঙ্গে বাবার দেখা হয়নি। উদ্ধারের পর থেকে মেয়ে আছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হেফাজতে। গতকাল দুপুরে গোয়েন্দা বিভাগের অভ্যর্থনাকক্ষেই কথা হয় এনবিআরের সদস্য (কর আপিলাত ট্রাইব্যুনাল) এ কে বোরহান উদ্দীনের সঙ্গে। মালিহার মা গোয়েন্দা বিভাগের হেফাজতে মেয়ের সঙ্গে থাকার সুযোগ পেয়েছেন। আর বাবা বাইরে বসেই কাটিয়ে দিচ্ছেন দিন-রাত। অপেক্ষা, কখন মেয়েকে বুকে টেনে নেবেন।

> মেয়ে জীবিত শুনে আনন্দে চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। তবে অন্য ছেলেমেয়েগুলোকে মেরে ফেলল। বিদেশি নাগরিক আমাদের মেহমান
>
> বোরহান উদ্দীন
> উদ্ধার হওয়া ফাইরুজ মালিহার বাবা

দেশ-বিদেশ থেকে শুভাকাঙ্ক্ষীরা ফোন দিচ্ছিলেন বোরহান উদ্দীনকে। তিনি ফোনে একজনকে বলছিলেন, 'আমার বাচ্চাটা বেঁচে আছে। রাষ্ট্রীয় হেফাজতে আছে। ভালো আছে। দোয়া করবেন।'

বোরহান উদ্দীন বলেন, 'ঘটনার পর অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটেছে। মেয়ের মা অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকেন। মেয়ে, না মেয়ের মা—কাকে রক্ষা করব, তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। মেয়ে জীবিত শুনে আনন্দে চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। তবে অন্য ছেলেমেয়েগুলোকে মেরে ফেলল। বিদেশি নাগরিক আমাদের মেহমান। তাঁদের মেরে ফেলল। যাঁরা মারা গেলেন, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কথা ভাবতেই কী যে কষ্ট লাগছে।' কথাগুলো বলে বোরহান উদ্দীন রুমাল দিয়ে চোখের পানি মুছলেন।

এক ছেলে এক মেয়ের বাবা বোরহান উদ্দীন। মেয়েকে আবার জীবিত পাওয়াকে জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বলে মনে করছেন মুক্তিযোদ্ধা বোরহান উদ্দীন। মেয়ের নতুন জন্ম হয়েছে মন্তব্য করে নিজের মনেই বললেন, সবগুলো বাচ্চা যদি জীবিত ফেরত আসত। ইসলামকে এভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। সম্ভাবনাময় সন্তান, তারাই-বা কেন জঙ্গি হচ্ছে, তাও ভাবিয়ে তুলছে।

ফাইরুজ মালিহা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। ১ জুলাই গুলশানে আর্টিজান রেস্তোরাঁর কাছেই তাঁর এক বান্ধবীর বাসায় ইফতারের দাওয়াত ছিল। ইফতার করে বান্ধবীকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় কফি খেতে যান। তারপরই ঘটে ঘটনা। এখন ওই বান্ধবীও আছেন গোয়েন্দা বিভাগের হেফাজতে।

প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই বিকেল পাঁচটার দিকে স্ত্রী টেলিফোন করে বোরহান উদ্দীনকে জানান মেয়ের পাসপোর্ট লাগবে। বাবা ছুটলেন উত্তরার বাসায় মেয়ের পাসপোর্ট আনার জন্য। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া নিয়ে বোরহান উদ্দীনের ক্ষোভ নেই। তিনি বলেন, 'জঙ্গিদের সম্পর্কে তথ্য পেতে আমার মেয়েসহ উদ্ধার পাওয়াদের একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে। তবে তাতে যদি দেশের ভালো হয়, তাই হয়রানি মনে করছি না।'

ফেসবুকে তিন জঙ্গি নিয়ে ঝড়

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

এ বছরেরই ঘটনা। ২৯ ফেব্রুয়ারি বিকেল তিনটা। কোচিংয়ে যাওয়ার উদ্দেশে গাড়িতে করে বের হয় ছেলেটি। বনানী ডিওএইচএসে পরিবারের সঙ্গে থাকে সে। স্কলাস্টিকা স্কুল থেকে ও-লেভেল পাস করে এ-লেভেলে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ জন্যই কোচিং। গুলশানের একটি কোচিং সেন্টারে যাওয়ার পথে যানজটে আটকে পড়ে তার গাড়ি। গাড়িচালককে ছয়টার দিকে কোচিং সেন্টারে গিয়ে তাকে আনতে বলে সে নেমে যায় গাড়ি থেকে। তারপর বেমালুম হাওয়া।

চিন্তায় পড়ে যান পরিবারের সদস্যরা। ছেলেটিকে কি অপহরণ করেছে কেউ, নাকি নিজে থেকেই কোথাও গিয়ে লুকিয়েছে? ওই দিনই বাবা গুলশান থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করলেন। গত ৭ মার্চ *মানবজমিন* পত্রিকায় এ নিয়ে একটি খবরও প্রকাশিত হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, পুলিশ ছেলেটিকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছিল। পরে তারা গুলশান এলাকার সিসিটিভি ফুটেজে দেখতে পায়, গাড়ি থেকে নামার পর একটি রিকশা নিয়ে সে বনানীর ১১ নম্বর সড়কের দিকে চলে যাচ্ছে।

ওই খবরের তথ্য অনুযায়ী, ওই জিডির তদন্তকারী কর্মকর্তা গুলশান থাকার উপপরিদর্শক (এসআই) নাজমুল জানান, ঘটনার দিন ২টা ৫৫ মিনিট থেকে ছেলেটির মুঠোফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। ওই সময় একটি সূত্র দাবি করে, সে সম্প্রতি ধর্মীয় উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

নিখোঁজ সেই তরুণের সঙ্গে গত শুক্রবার গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় জড়িত বলে প্রকাশিত একজনের ছবির মিল পাওয়া গেছে। ফেসবুকে এ নিয়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের তথ্য অনুযায়ী, সেই ছেলেটির নাম মীর সামেহ মোবাশ্বের। গুলশানের রেস্তোরাঁয় সন্ত্রাসী হামলায় অংশ নেওয়া সন্ত্রাসীদের যেসব ছবি আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) ও জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) বার্তা সংস্থা হিসেবে পরিচিত আমাক-এর প্রকাশিত ছবিগুলোর মধ্যে একটি ছবির সঙ্গে এই মোবাশ্বেরের ছবির মিল রয়েছে বলে অনেকেই ফেসবুকে মন্তব্য করেছেন। এসব মন্তব্যে ছিল বিস্ময়, পরিতাপ, ভালোবাসা আর শোক।

ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া ব্যক্তিরা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না, এত সুন্দর পরিবেশে থেকে, সর্বাধুনিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েও এরা এমন নির্মম সন্ত্রাসী তাণ্ডব চালাতে পারে!

শুধু মীর সামেহ মোবাশ্বেরই নয়, নিবরাস ইসলাম নামের আরেক তরুণের ব্যক্তিগত পটভূমিও বেশ জ্বলজ্বলে। গুলশানের ঘটনায় আইএসপিআরের প্রকাশিত রক্তাক্ত অবস্থায় নিথর হয়ে পড়ে থাকা এক সন্ত্রাসীর ছবির সঙ্গে ফেসবুকে প্রকাশিত নিবরাসের ছবির সাদৃশ্য রয়েছে। নিহত ওই সন্ত্রাসীকে এই নিবরাস বলে শনাক্ত করেছেন অনেকে। ফেসবুক স্ট্যাটাসে একজন বলেছেন, এত মিষ্টি ছেলেটা কীভাবে পারে গুলশানে জঙ্গি অ্যাটাক দিতে! এখানে নিবরাসের নিষ্পাপ চেহারার সঙ্গে ওই নৃশংসতার তুলনা করে আফসোস করা হয়েছে।

ফেসবুকে নিবরাসের একটি ভিডিও পাওয়া গেছে, যেখানে এক বন্ধুর সঙ্গে যেতে যেতে ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলছিল সে। এতে এটা স্পষ্ট যে পারিবারিক অবস্থানের দিক দিয়ে সমাজের সচ্ছল শ্রেণিতেই ছিল তার অবস্থান। সে যে একসময় অত্যাধুনিক পরিবেশে বিচরণ করত, ফেসবুকে দেওয়া বন্ধুদের সঙ্গে তোলা কিছু ছবি তা প্রমাণ করে। বলিউড তারকা শ্রদ্ধা কাপুরের ভক্ত এই তরুণ তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে প্রিয় তারকার সঙ্গে তার হাত মেলানোর মধুর অনুভূতিও প্রকাশ করেছে।

গুলশানে নিহত আরেক সন্ত্রাসীর ছবির সঙ্গে যে তরুণের চেহারার সাদৃশ্য পাওয়া গেছে, সে রোহান ইবনে ইমতিয়াজ। সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তিতে তার অবস্থানও বেশ উঁচুতে। মা-বাবার সঙ্গে ফেসবুকে তার যেসব ছবি রয়েছে, এই ছেলেটির সঙ্গে নিহত ওই সন্ত্রাসীর মিল থাকার কথা অনেকেই বলেছেন। সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে রোহানের বাবা বেশ প্রভাবশালী। গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু সংগঠনের সদস্য তিনি। মা-বাবা ও সহপাঠীদের সঙ্গে ফেসবুকে তার যে ছবি দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গে আমাক-এর প্রকাশিত ওই জঙ্গির মিল খুঁজে পেয়ে পরিচিত অনেকেই স্তম্ভিত, মর্মাহত।

রোহানের বাবা নিজের ফেসবুক থেকে গত জানুয়ারি মাসে মা ও ছেলের একটি যুগল ছবি পোস্ট করে ইংরেজিতে লিখেছিলেন, 'বাবা, তোমার মা অসুস্থ। দয়া করে ফিরে এসো।' গত ১১ জুন আকুতি জানিয়ে আবার লিখেছেন, 'বাবা, তুমি কোথায়? প্লিজ, ফিরে এসো।'

এসব স্ট্যাটাস থেকে এটি পরিষ্কার যে রোহান পরিবার থেকে দীর্ঘ সময় ধরে বিচ্ছিন্ন ছিল।

রেস্তোরাঁয় জঙ্গি হামলার পর গুলশানের ৭৯ নম্বর সড়কের মাথায় ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে পুলিশ। সেখানে জনসাধারণের প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। তাই ব্যারিকেডের সামনেই ফুল ও প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি রেখে নিহত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে মানুষ। গতকাল দুপুরে তোলা ছবি ● প্রথম

গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলার ঘটনা নিয়ে ফেসবুকে চলছে নানা আলোচনা। এর মধ্যে নিহত ব্যক্তিদের জন্য আছে যেমন শ্রদ্ধা ও সমবেদনা, তেমনি হামলাকারীদের বিষয়েও আছে নানা তথ্য

আইএসের বার্তা সংস্থা আমাক প্রকাশিত জঙ্গিদের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে গতকাল ফেসবুকে নিবরাস ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন তাঁর বন্ধুরা

রোহান ইবনে ইমতিয়াজ

গুলশানে নিহত আরেক জঙ্গির ছবির সঙ্গে যে তরুণের চেহারার সাদৃশ্য পাওয়া গেছে, তিনি রোহান ইবনে ইমতিয়াজ।

আমাক-এর প্রকাশিত ছবিগুলোর মধ্যে একটি ছবির সঙ্গে এই মোবাশ্বেরের চেহারার মিল রয়েছে বলে অনেকেই ফেসবুকে মন্তব্য করেছেন। এসব মন্তব্যে অনেকেরই ছিল বিস্ময়

প্রথম আলো
gulfedition@prothom-alo.info

শোকার্ত বাংলাদেশ

স্বজনহারা পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ান

১ জুলাই রাতভর রাজধানীর গুলশান এলাকার এক রেস্তোরাঁয় সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ব্যক্তিদের শোকে স্তব্ধ হয়ে গেছে বাংলাদেশ। দুই দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হচ্ছে। ঘটনার পরের দুই দিন ঢাকার রাস্তাঘাটে যানবাহনের চলাচল, বিপণিবিতান ও হোটেল-রেস্টুরেন্টগুলোতে লোকসমাগম ছিল বেশ কম। সর্বত্র শোকের আবহ। শোকাবহ পরিবেশের প্রতিফলন ঘটছে প্রতিদিনের সংবাদমাধ্যমে।

স্বজনহারা পরিবারগুলোর মানুষেরা দুর্বহ বেদনায় মুহ্যমান। তাঁদের ওপর এই আকস্মিক আঘাত এসেছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। এই রিক্ত, বেদনার্ত মানুষদের সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো ভাষা নেই। আসলে তাঁরা যা হারিয়েছেন, তার শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়। তাঁদের এই অত্যন্ত কঠিন মুহূর্তে সরকারসহ আমাদের সবার উচিত তাঁদের পাশে দাঁড়ানো। আমরা তাঁদের প্রতি সৌহার্দ্য-সহমর্মিতা জানাই। কামনা করি, তাঁরা এই শোক কাটিয়ে উঠুন। যাঁরা একান্তে শোক পালন করতে চান তাঁদের সেই ইচ্ছার প্রতি সবাই শ্রদ্ধাশীল থাকবেন, সেটাই প্রত্যাশা।

সরকারের পক্ষ থেকে এখন তাঁদের এই আশ্বাস প্রয়োজন যে এই বর্বর হত্যাযজ্ঞের তদন্ত হবে, এর পেছনের শক্তিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হবে এবং আইনি প্রতিকারের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করা হবে যে তারা যতই সংগঠিত ও শক্তিশালী হোক, বিচার ও দণ্ডের ঊর্ধ্বে থাকতে পারবে না। বলা বাহুল্য, গুলশান হত্যাযজ্ঞ আঘাত হেনেছে পুরো জাতিকেই। স্বজনহারা পরিবারগুলোর সঙ্গে একাত্ম হয়েছে সমগ্র জাতি। এখন সম্মিলিতভাবে এই শোক কাটিয়ে উঠতে হবে। যে অন্ধকারের শক্তি পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে, তাকে রুখতে হবে সম্মিলিতভাবে। এটা স্পষ্ট যে এই সহিংস, বর্বর গোষ্ঠীগুলো আমাদের সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক অশুভ শক্তি, এই সমাজে তাদের কোনো স্থান নেই। জনগণের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ জীবনে ভীতি, আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার বোধ ছড়িয়ে দেওয়ার যত চেষ্টাই তারা করুক না কেন, তারা সফল হবে না। সন্ত্রাস ও মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে এই সমাজের প্রতিরোধশক্তি চিরকালীন।

এই শোকের মুহূর্তে পুরো জাতিকে এক হতে হবে। রাজনৈতিক মতামতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সবাই মিলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে, এ ধরনের বর্বর হত্যাযজ্ঞের পুনরাবৃত্তি আর কখনো হবে না।

এক পরীক্ষা না দুই পরীক্ষা?

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা নয়

বিতর্ক উঠেছে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা একটি সমাপনী পরীক্ষা দেবে, না দুটি। বর্তমানে যে প্রাথমিক ও জুনিয়র সমাপনী পরীক্ষা চালু আছে, তার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষাবিদেরা। এতে শিক্ষা পাঠমুখী না হয়ে কোচিংমুখী হয়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ। আমরা আরও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি যে শিক্ষা নিয়ে সরকারের কার্যক্রমে কোনো শৃঙ্খলা নেই। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিইসি) নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে। দেড় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে পিইসি নিয়ে বারবার সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন কোনোভাবেই মানা যায় না।

গত ১৮ মে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত দুই মন্ত্রী সংবাদ সম্মেলন করে প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হবে বলে জানিয়ে দেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, প্রাথমিক শিক্ষার স্তর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হলে পঞ্চম শ্রেণিতে পরীক্ষা নেওয়ার কী যুক্তি? বিভিন্ন মহলের আপত্তি আমলে নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী চলতি বছর পঞ্চম শ্রেণিতে পিইসি হবে না বলে ঘোষণাও দিয়েছিলেন। কিন্তু গত সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়। কয়েকজন জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবকাঠামো না হওয়া পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান স্তর পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের কথায় যুক্তি থাকলেও ২০১০ সালে ঘোষিত শিক্ষানীতি ২০১৬ সালেও বাস্তবায়ন কেন হয়নি, সেই প্রশ্নের উত্তর নেই। বহুলালোচিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন নিয়ে এই গড়িমসি দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক নয়।

শিক্ষা নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারকদের ভেতরে যতই মতভেদ থাকুক না কেন তাঁরা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারেন না। শিক্ষার উন্নয়ন ও সংস্কার চাইলে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন জরুরি। জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীরা যে অবকাঠামোগত সমস্যার কথা বলেছেন, তার প্রতিকারও 'পুরোনো ব্যবস্থা বহাল' রেখে হতে পারে না।

আমরা আশা করব, সরকার পিইসির যন্ত্রণা থেকে শিশু শিক্ষার্থীদের রেহাই দেবে। কেননা, এতে কোচিং ব্যবসার প্রসার ঘটলেও শিক্ষার্থীদের খুব একটা লাভ হচ্ছে না।

বাংলাদেশি স্বপ্ন ও হিরো আলম

অ র ণ্যে রো দ ন

আনিসুল হক

'দ্য আমেরিকান ড্রিম' বলে একটা কথা আছে। আমেরিকান স্বপ্ন। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমমর্যাদা, সুযোগ, চেষ্টা এবং উন্নতি—এই হলো আমেরিকান স্বপ্নের মূল কথা। কঠোর পরিশ্রম, সাধনা করলে আমেরিকায় তুমি উন্নতি করতে পারবে। এ জন্য তোমাকে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাতে হবে না। তোমাকে অভিজাত হতে হবে না। ওই দেশে একজন শ্রমিক আর একজন বুদ্ধিজীবীর কদর সমান। তুমি পরিশ্রম করো, তোমার ছেলেমেয়েদের ভালো শিক্ষা দাও, দেখবে ওরা অনেক বড় হবে। আমেরিকা হলো সুযোগের দেশ। ও দেশে যে কেউ উন্নতি করতে পারে, সীমাহীন উন্নতি, আকাশ হলো সীমা।

বাংলাদেশও এখন সুযোগের দেশ হয়ে উঠছে। 'বাংলাদেশি স্বপ্ন' বলে একটা ব্যাপার নীরবে আকার পাচ্ছে। পরিশ্রম করো, সুযোগ যদি তোমার জীবনে এসে যায়, তুমি যদি কাজে লাগাও, তুমিও সীমাহীন উন্নতি করতে পারবে। তবে আমেরিকার সঙ্গে বাংলাদেশের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। আমেরিকায় কঠোর পরিশ্রম তোমাকে সাফল্য এনে দেবে, তবে সেই সাধনাটা করতে হবে আইনানুগ পদ্ধতিতে। আর বাংলাদেশ যে এখন সুযোগের চাঁদের হাট হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে আছে আইনকানুন ভেঙে ফেলা, পুকুরচুরির সুযোগও। আপনি মানুষের জমিজমা জোর করে দখল করুন এবং সেসব বিক্রি করতে শুরু করুন প্লট হিসেবে। জমি দখলও করতে হবে না, কাগজে চারকোনা দাগ এঁকে প্লট নম্বর বসিয়ে দিন, আর বিজ্ঞাপন দিন, আকর্ষণীয় মূল্যে প্লট বিক্রি হচ্ছে, আপনি কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে উঠবেন কোটি কোটি টাকার মালিক। এই দেশে পুরোনো বাসনকোসন ফেরিওয়ালার ছেলে ব্যাংক থেকে আত্মসাৎ করতে পারে হাজার হাজার কোটি টাকা। এই দেশে ক্ষমতার ছায়াতলে আছেন, এই রকম একটা কিংবদন্তি ছড়িয়ে দিয়েই আপনি আয় করতে পারবেন কোটি কোটি টাকা, পিয়ন নিয়োগ দিয়ে, কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে, বদলি ও নিয়োগ-বাণিজ্য করে। ঠিকাদারি, সরবরাহ ইত্যাদি করেও সোনার হরিণ ধরা যায়। আপনি ভবন বানাতে লোহার বদলে দেবেন বাঁশের ফালি, আপনি সরকারি গম আমদানি করতে নিয়ে আসুন পচা গম, আপনি নদীভাঙন রোধ করতে পাঁচ লাখ বালুর বস্তার বদলে ফেলুন পাঁচ হাজার, বড়লোক হওয়ার এক শ কোটি রাস্তা খোলা আছে এই দেশে। আপনি বন দখল করুন, হয়ে উঠুন বনখেকো, নদী দখল করুন, হয়ে উঠুন নদীখেকো, জমি দখল করুন, হয়ে উঠুন ভূমিদস্যু।

এই রকম পুকুরচুরি, নদীচুরি, সমুদ্রচুরির সুযোগ সবাই পায় না, কিন্তু বাংলাদেশের কোটি ঘরে আজ একটা বড় হওয়ার স্বপ্ন, ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন, আমার সন্তান দুধে-ভাতে থাকবে না শুধু, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, এই স্বপ্ন দানা বেঁধেছে। সেটা এসেছে প্রধানত ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়ার উচ্চহার থেকে। পাশাপাশি আর্থিক সচ্ছলতা থেকে। আমাদের অভিবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স আর আমাদের গার্মেন্টস এবং সর্বক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের উন্নতির প্রয়াস বাংলাদেশকে তুলে দিয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মহাসড়কে। বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। এখন আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় প্রায় তিন হাজার কোটি ডলার। মানুষ মোটামুটিভাবে সবাই খেতে পায়, সবার পায়ে জুতা-স্যান্ডেল আছে এবং সবার ছেলেমেয়ে স্কুলে যায়। এই সব ঘরে এখন বড় হওয়ার স্বপ্ন। ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করবে এবং মানুষ হবে। দিন বদলাবে। অনেক ঘরে স্বপ্ন হলো, ছেলে বিদেশ যাবে। টিনের ঘর হবে দোতলা-তেতলা।

মানুষ দেখছে, তার চারপাশেই তৈরি হচ্ছে উদাহরণ। মাছের চাষ করে কেউ ভাগ্য বদলে ফেলেছে। কেউ দারিদ্র্য দূর করেছে ভুট্টার চাষ করে। কেউ বা করেছে হাঁস-মুরগির খামার। ব্যবসা করে, শিল্প-কলকারখানা গড়ে মানুষ ভাগ্য বদলাচ্ছে। আর আছে শিক্ষা। এই দেশে মানুষ দেখেছে, লেখাপড়া করে যেই জুড়িগাড়ি চড়ে সেই। লেখাপড়া করে ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে পেরেছেন এমন সফল মানুষের উদাহরণ চোখের সামনে অনেক। ছোটবেলায় খাবার জুটত না, হয়তো মা করতেন গৃহপরিচারিকার কাজ, সেই ছেলে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়ে এখন করছেন অধ্যাপনা। হয়েছেন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার, হয়েছেন সরকারি কর্মকর্তা, হয়েছেন বড় শিল্পপতি—এই ধরনের উদাহরণ অনেকই তৈরি হয়েছে।

মানুষের মনে তৈরি হয়েছে আশা। আশা হলো একটা ট্রেনের ইঞ্জিন, যা অনেকগুলো বগিকে সামনে টেনে নিয়ে যায়। বাংলাদেশের মানুষদের মনেও তৈরি হয়েছে আশা। এবং এই আশার বেশির ভাগটাই বৈষয়িক। তাই এই দেশে শিক্ষার্থী কম, সবাই পরীক্ষার্থী, সবাই সুফলার্থী। আমরা আমাদের ছেলেমেয়ের স্কুলে এ জন্য পাঠাচ্ছি না যে তারা লেখাপড়া শিখে আলোকিত-হৃদয় মানুষ হবে। আমাদের স্বপ্ন হলো, তারা সফল হবে পেশাগত জীবনে, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে, জজ-ব্যারিস্টার হবে, টাকাপয়সা আয় করবে। সে জন্যই চলছে জিপিএ ফাইভ পাওয়ার ইঁদুর দৌড়। একেকটা বাচ্চার পেছনে বাবা-মায়ের কী অহর্নিশ পরিশ্রম। মা ছুটছেন ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে একবার স্কুলের দ্বারে, একবার কোচিং সেন্টারের দরজায়। আমাদের যে কোচিং-গাইডবই-প্রশ্নপত্র ফাঁসের সমস্যা, তার সবকিছুর পেছনেই রয়েছে এই পার্থিব বাংলাদেশি স্বপ্ন। ভাগ্য বদলানোর উপায় হিসেবে সন্তানকে সার্টিফিকেট অর্জন করতে দেওয়া।

বগুড়ার গ্রামের আশরাফুল আলম এখন হিরো আলম হয়ে উঠেছেন। তাঁকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে

বাংলাদেশি স্বপ্নের অনেক সুন্দর সুন্দর উদাহরণ আমরা প্রকাশ করি গণমাধ্যমে। আমরা পাঠ করি অদম্য মেধাবীদের সাফল্যের কাহিনি। আমরা দেখি, মাগুরার ছেলে সাকিব আল হাসান আসেন সাভারের বিকেএসপিতে, তিনি হয়ে ওঠেন পৃথিবীর এক নম্বর অলরাউন্ডার। দেখতে পাই মুস্তাফিজুর রহমানকে। সাতক্ষীরা থেকে আসেন ঢাকায়, প্রতিভা আর অনুশীলন তাঁকে সুযোগ দেয় জাতীয় দলে, তিনি হয়ে ওঠেন পৃথিবীর বোলিং সেনসেশন।

দ্য বাংলাদেশি ড্রিমের একটা উদাহরণ সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি হিরো আলমের ক্ষেত্রে। *কালের কণ্ঠের* খবর অনুসারে, আশরাফুল আলম নামের এই তরুণের বাড়ি বগুড়ার এরুলিয়া ইউনিয়নের এরুলিয়া গ্রামে। ছোটবেলায় অভাবের তাড়নায় নিজ বাবা-মায়ের সংসার ছেড়ে তাঁকে আশ্রয় নিতে হয় একই গ্রামের আবদুর রাজ্জাকের বাড়িতে। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছেন তিনি। তারপর সিডি বিক্রির ব্যবসা করতেন। সেখান থেকে তিনি শুরু করেন ডিশের ব্যবসা। ভালোই চলছে তাঁর আয়-রোজগার। এরপর তাঁর শখ হয় নিজে মডেল হবেন। বাংলা সিনেমার মিউজিক ভিডিও তৈরি করেন তিনি, নিজেই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। সঙ্গে মডেল কন্যারা অংশ নেন সেই ভিডিওতে। সেসব তিনি দেখাতেন তাঁর নিজের গ্রামের ডিশেরই লাইনে। কিন্তু এখন তো সামাজিক মাধ্যমের যুগ। আছে ফেসবুক, আছে ইউটিউব। সেসব ছড়িয়ে পড়ে ইন্টারনেটে।

প্রচলিত অর্থে আশরাফুল আলম নায়কোচিত প্রতিভার অধিকারী নন। তিনি দেখতে উত্তমকুমারের মতনও নন, শাকিব খানের মতনও নন। কিন্তু বাংলা ছবির প্রচলিত মুদ্রাগুলো নিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছেন ক্যামেরার সামনে। ফেসবুকে এই ভিডিওগুলো ভাইরাল হতে থাকে। প্রথমে শোনা যায় হাসির হররা। কিন্তু তারপরেই একদল ফেসবুকার তৈরি করেন পাল্টা মত। তাঁরা বলেন, নায়ক হতে গেলে ফরসা হতে হবে, লম্বা হতে হবে, শীলিত হতে হবে—কে আপনাদের এই ধারণা দিয়েছে? এই মত ও পাল্টা মতের ধাক্কায় এখন জাতীয় গণমাধ্যমও তাঁর পরিচয় তুলে ধরেছে, পত্রিকার শিরোনাম হয়েছে—কে এই হিরো আলম। শুনতে পাচ্ছি, তাঁকে ঢাকায় আনা হয়েছে, বিভিন্ন টেলিভিশন তাঁকে নিয়ে অনুষ্ঠানও করছে।

অর্থাৎ কিনা বগুড়ার গ্রামের আশরাফুল আলম এখন হিরো আলম হয়ে উঠেছেন। তাঁকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। হাসাহাসির ফাঁক গলে তিনি হয়ে উঠছেন একধরনের সেলিব্রেটি।

পুঁজিবাদের বিকাশের এই কালে এই রকমটা হওয়ারই কথা। সে ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই সমাজবিজ্ঞানীরা দিতে পারবেন। আবার এটাকে দেখা যায় 'বাংলাদেশি ড্রিম' হিসেবেও। হিরো আলম কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে আলোচিত-সমালোচিত হবেন বলে ওই মিউজিক ভিডিও বানাননি। এটা তাঁর প্যাশন, স্বপ্ন, ভালো লাগা। তাঁর ডিশের লাইন আছে, তাই তিনি মিউজিক ভিডিও বানাতে এগিয়ে এসেছেন, বানিয়েছেন, নিজ গ্রামে দেখিয়েছেনও। এখন তো প্রচারের জন্য জাতীয় গণমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয় না। ইন্টারনেট তাঁকে প্রচার দিয়েছে।

একটা জিনিস বোধ হয় এইখানটায় বুঝে নেওয়ার দরকার আছে। মুস্তাফিজুর রহমান কিন্তু পৃথিবীর সেরা বোলারদের একজন হওয়ার জন্য খেলতে নামেননি। খেলতে তাঁর ভালো লাগত বলে তিনি খেলতে নেমেছিলেন। হ্যাঁ, তিনি পরিশ্রম করেছেন। ৪০ কিলোমিটার মোটরবাইকের পেছনে বসে রোজ ছুটে গিয়ে সাতক্ষীরায় সুন্দরবন ক্রিকেট একাডেমিতে নিয়মিত অনুশীলন করেছেন। প্রতিভা ছিল, তা তাঁকে নিয়ে গেছে আন্তর্জাতিক পরিসরে।

এখন দরকার হবে সাসটেইন করা। টিকে থাকা। 'স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ, উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল এই তারি আনন্দ'—এ যেন না হয়। আমরা তো এই রকম অনেক দেখেছি, হঠাৎ আবির্ভূত হিরোরা আজকে আলোচিত, কালকেই তাঁদের আর কোনো চিহ্ন থাকে না। আমাদের 'তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ' ধরনের প্রতিযোগিতার শিল্পীরা, যাঁরা মহাহইচই ফেলে দিয়েছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগেরই তো কোনো খবর আমরা আর রাখি না। এই ধরনের সাফল্য টিকবে না, যদি না প্রতিভা, সাধনা, অনুশীলন, শিক্ষা আর সুযোগের সমন্বয় না ঘটে। অল্প শিক্ষা, অল্প পরিশ্রম, অল্প দিনে পাওয়া সাফল্য স্থায়ী হয় না।

রবীন্দ্রনাথের একটা সুন্দর গান আছে। 'জোনাকি কী সুখে ওই ডানা দুটো মেলেছ।' তাতে তিনি বলছেন, 'তুমি নও তো সূর্য, নও তো চন্দ্র, তোমার তাই বলে কি কম আনন্দ। তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে আপন আলো জ্বেলেছ।' সবাইকে তো চাঁদ-সূর্য-তারকা হতে হবে না। জোনাকি নিজের সাধ্যমতো মনের আনন্দে আলো দেবে। সে তখন ছোট হয়েও আর ছোট থাকবে না।

সেটাই আসল কথা। আমরা যদি নিজের সাধ্যমতো আলো দিই, ভালো কাজ করি, নিজের জীবনটুকুই যাপন করে যাই, সেটাই বা কম কী।

তবে আমেরিকান ড্রিমের মতোই ঘরে ঘরে যে বাংলাদেশি স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছি, সেটাকে আমাদের স্বাগত জানাতেই হবে। শুধু সেই স্বপ্নপূরণের জন্য আমরা যেন অন্ধকারের পথে না হাঁটি। সেটাও আসলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সুশাসন, আইনের শাসন নিশ্চিত হলে ১৬ কোটি প্রাণে জ্বলে ওঠা বাংলাদেশি স্বপ্ন কেবল আলোকের পথেই নিজেকে বিকশিত করতে চাইবে, অন্ধকারের ফাঁকফোকর খুঁজবে না।

বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রটি তার ১৬ কোটি নাগরিকের স্বপ্নের উপযোগী হয়ে উঠুক।

● **আনিসুল হক : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।**

জাকাত ও সদকার উপকারিতা

ধ র্ম

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

জাকাত ও সদকা দেওয়ার নানাবিধ উপকারিতা রয়েছে। ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই এর উপকারিতা রয়েছে। জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে একদিকে সম্পদ পবিত্র হয়, অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা এর বরকতে প্রবৃদ্ধি ও প্রাচুর্য দান করেন। এ প্রসঙ্গে কোরআনে ঘোষণা হয়েছে, 'আল্লাহ সুদকে নিঃশেষ করে দেন, সদাকাতকে প্রবৃদ্ধি ঘটান; আর আল্লাহ অপরাধী কাফিরদের পছন্দ করেন না।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত : ২৭৬)। হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'দাতা আল্লাহর কাছে প্রিয়, মানুষের কাছে সম্মানিত, জান্নাতের কাছে ও নিকটতম; জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থিত। সাধারণ দাতা কৃপণ আবেদ অপেক্ষা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।' (তিরমিজি শরিফ)। এ ছাড়া জাকাতের সামাজিক অনেক সুফল রয়েছে।

অর্থের প্রবাহ বা সঞ্চালন

জাকাত দিলে নগদ অর্থ হাতবদল হয়। এতে সম্পদে গতিশীলতা আসে। যাতে প্রচুর লোক ক্রয়ক্ষমতা অর্জন করে, তাতে চাহিদা বা ভোক্তা সৃষ্টি হয়। ক্রেতা সৃষ্টি হলে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়, শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা হয়, কর্মসংস্থান হয়। যার ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়।

দারিদ্র্য বিমোচন

সঠিকভাবে যথাযথ নিয়মে জাকাত আদায় বা প্রদান করলে সমাজের দারিদ্র্য দূরীভূত হবে, অপরাধপ্রবণতা কমবে এবং আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয় থেকে জাতি রক্ষা পাবে। সর্বোপরি সুদের নাগপাশ থেকে মুসলমানরা রক্ষা পাবে।

মানবিক উন্নয়ন

জাকাত আদায়ের মাধ্যমে খাই খাই মানসিকতার অবসান হয়, দাতার তালিকায় নাম ওঠে এবং আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ সৃষ্টি হয়। এতে ধনী-গরিবের বিভেদ দূর হয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা সম্প্রীতি তৈরি হয়, সহমর্মিতা ও সামাজিক নিরাপত্তাবলয় গঠিত হয়; এতে দাতা-গ্রহীতা উভয়ের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার হয়। সমাজদেহ থেকে কার্পণ্য, লোভ, মোহ এবং হিংসা, পরশ্রীকাতরতাসহ নানাবিধ দুষ্ট উপসর্গ দূরীভূত হয়।

জাকাত ও সদকা না দেওয়ার বিপদ

এ প্রসঙ্গে কোরআনে ঘোষণা হয়েছে, 'যারা সোনা-রুপা (ধনসম্পদ) কুক্ষিগত করে রাখে এবং তা আল্লাহ নির্দেশিত পথে ব্যয় করে না; আপনি তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ (?) দিন! যেদিন তা জাহান্নামের আগুনে গরম করে তাদের চেহারায়, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে; আর বলা হবে—এ হলো যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে। সুতরাং, যা জমা রেখেছিলে, তার স্বাদ গ্রহণ করো।' (সুরা-৯ তাওবা, আয়াত : ৩৪-৩৫)। হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলে আকরাম (সা.) বলেন, 'কৃপণ আল্লাহ থেকে দূরে (আল্লাহর অপ্রিয়), মানুষ থেকে দূরে (মানুষের অপছন্দের), জান্নাত থেকেও দূরে এবং জাহান্নামের কাছে (নিকটবর্তী)। কৃপণ আবেদ অপেক্ষা সাধারণ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।' (তিরমিজি শরিফ)। এ ছাড়া জাকাত না দেওয়ার বহুবিধ সামাজিক কুফল রয়েছে।

অর্থনৈতিক মন্দা

জাকাত সদকা প্রদান না করলে নগদ অর্থ হাতবদল হয় না। এতে সম্পদে গতিশীলতা আসে না। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তৈরি হয় না, চাহিদা বা ভোক্তা সৃষ্টি হয় না, ক্রেতা সৃষ্টি না হলে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় না, শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা হয় না, কর্মসংস্থান হয় না, যার ফলে অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব ও জনজীবনে স্থবিরতা পরিলক্ষিত হয়।

দারিদ্র্য বৃদ্ধি

জাকাত আদায় না করলে সমাজের দারিদ্র্য বাড়তে থাকে, সমানভাবে অপরাধপ্রবণতাও বাড়ে এবং আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেয়। সর্বোপরি মুসলমানরা সুদের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে নিষ্পেষিত হতে থাকে।

মানবিক অবক্ষয়

জাকাত আদায় না করলে ধনী-গরিবের বিভেদ বা মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকে না, ভালোবাসা সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়, সহমর্মিতা থাকে না ও সামাজিক নিরাপত্তাবলয় ভেঙে যায়, অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়, এতে উভয়ের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। সমাজে কার্পণ্য, লোভ, মোহ এবং হিংসা, পরশ্রীকাতরতাসহ নানাবিধ দুষ্ট উপসর্গ বাসা বাঁধে।

সামাজিক অবক্ষয়

কর্মহীন হতাশাগ্রস্ত যুবসমাজ মাদক ও নেশার প্রতি ঝোঁকে, বিভিন্ন জটিল ও কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি হয়, যার পরিণতিতে আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুনখারাবি, সুদ, ঘুষ, জুয়া, খুনোখুনি ও দুর্নীতির মতো আর্থসামাজিক কেলেঙ্কারির ঘটনা বৃদ্ধি পায়। একসময় অবস্থা এমন হয়; হাদিস শরিফে রয়েছে, রাসুলে মাকবুল (সা.) বলেন, 'দারিদ্র্য মানুষকে কুফরির নিকটবর্তী করে দেয়।' (তিরমিজি শরিফ)।

সরকারি কর জাকাতের বিকল্প নয়

ইসলামি খেলাফত রাষ্ট্রে সরকারি ব্যবস্থাপনাতেই জাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়। যেহেতু জাকাত আল্লাহর নির্ধারিত ফরজ ইবাদত এবং এর ব্যয়ের খাতও সুনির্দিষ্ট। এর সঙ্গে রয়েছে ইসলামি শরিয়ার নিবিড় সম্পর্ক, তাই রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্যকৃত কর প্রদান জাকাত প্রদানের বিকল্প নয়। (কায়রো ইসলামি গবেষণা একাডেমি, মিসর, জাকাত নির্দেশিকা, পৃষ্ঠা : ১০৩)।

মসজিদভিত্তিক জাকাত ব্যবস্থাপনা

জাকাত আর্থিক ও সামাজিক ইবাদত। মসজিদ হলো মুসলমানের সকল কর্মকাণ্ডের মূল সামাজিক কেন্দ্র। তাই আমাদের জাকাত আদায় ও প্রদান মসজিদভিত্তিক হওয়াই স্বাভাবিক।

● **মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী : যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি, সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম।**
smusmangonee@gmail.com

'সিলেটের মানুষ দেয় বেশি, পায় কম'

স রে জ মি ন

সোহরাব হাসান

সিলেট শহরে যেতেই দেখা যাবে অসংখ্য মার্কেট-হোটেল। বড় বড় ভবন। কিন্তু কোনো শিল্পকারখানা চোখে পড়বে না। প্রশ্ন জাগবে, তাহলে সিলেটবাসী কি শিল্প স্থাপনে অনাগ্রহী? তাঁরা কি শুধুই ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা লন্ডনযাত্রায় উৎসাহী? সিলেট তিন-তিনজন 'সফল' অর্থমন্ত্রী উপহার দেওয়া সত্ত্বেও শিল্পায়নে এলাকাটি পিছিয়ে আছে। কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর জানতেই সোমবার সন্ধ্যায় স্থানীয় এক হোটেলে সিলেটের শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপ করি। সেদিন ছিল একটি ব্যবসায়ী সংগঠনের ইফতার পার্টি। এ কারণে প্রায় সব শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাকে সেখানে পেয়ে যাই। আলোচনায় ছিলেন সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সহসভাপতি মাসুদ আহমেদ চৌধুরী, সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক মো. লায়েছ উদ্দিন, মুকির হোসেন চৌধুরী, এমদাদ হোসেন, এ টি এম শোয়েব, বশিরুল হক, সিলেট সিএনজি পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আমিরুজ্জামান চৌধুরী দুলু, তৌফিক মজিদ লায়েক প্রমুখ।

প্রশ্নের জবাবে ব্যবসায়ী নেতারা বললেন, সিলেটের ব্যবসায়ীরা শিল্পকারখানা করতে চান না, এ কথা ঠিক নয়। শিল্প প্রতিষ্ঠায় তাঁদের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। কিন্তু একটি অঞ্চলকে শিল্পায়িত করতে যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন, তার কিছুই এখানে নেই। জানতে চাই, কী রকম? তাঁরা বললেন, সিলেট দেশের এক প্রান্তে অবস্থিত। রাজধানী ও সমুদ্রবন্দর থেকে অনেক দূরে। তদুপরি যোগাযোগব্যবস্থা নাজুক।

পাল্টা প্রশ্ন করি, সিলেট ও ঢাকার মধ্যে বাস ও ট্রেন সার্ভিস আছে। আছে বিমান সার্ভিসও। এই সুবিধা তো অনেক স্থানে নেই। একজন ব্যবসায়ী নেতা জানান, বর্তমানে ঢাকা-সিলেট সড়কটি খুবই বেহাল। যানজট লেগে থাকে। সড়কটি অপ্রশস্ত হওয়ায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। এ কারণেই আমরা ঢাকা-সিলেট সড়কটি চার লেন করার দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু সরকার সেটি দুই লেনের বেশি করতে রাজি হলো না। অন্যদিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক চার লেন করা হলো। অথচ সড়কপথে সিলেট অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি পর্যটক আসেন। আমরা কী দোষ করলাম? আমি বলি, অবশ্যই আপনারা কোনো দোষ করেননি। ভবিষ্যতে হয়তো সিলেট-ঢাকা সড়ক চার লেন হবে। তাঁরা বললেন, যখন সেটি হবে তখন আর চার লেনে কাজ হবে না। ছয় লেন দরকার হবে।

অন্যান্য অঞ্চলের মতো সিলেটের ব্যবসায়ীরাও মনে করেন, সরকারের কর্তাব্যক্তিদের সব মনোযোগ ঢাকায়। বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলো কীভাবে চলছে; দেখার কেউ নেই। একজন ব্যবসায়ী নেতা বললেন, সিলেট-চট্টগ্রাম সড়কটি সোজাসুজি নয়। অনেক ঘুরে আসতে হয়। সিলেট-চট্টগ্রাম হাইওয়ে ও সরাসরি ট্রেন সার্ভিস হওয়া প্রয়োজন। তাঁর কথায় যুক্তি আছে। শিল্পের কাঁচামাল কিংবা উৎপাদিত পণ্যটি সহজে আনা-নেওয়া করতে না পারলে উদ্যোক্তারা সেখানে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করবেন কেন? ব্যবসায়ীদের মতে, কেবল ঢাকা ও চট্টগ্রামের সঙ্গেই সিলেটের যোগাযোগব্যবস্থা ভঙ্গুর নয়। সিলেটের সঙ্গে এ অঞ্চলের অন্যান্য জেলা যথাক্রমে মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জের সড়কগুলো আরও শোচনীয়। অনেক সড়কই ভাঙাচোরা ও খানাখন্দে ভরা। একজন জানালেন, সিলেট-ভোলাগঞ্জ-কোম্পানীগঞ্জ সড়ক দিয়ে দেশের ৯০ শতাংশ পাথর পরিবহন করা হয়। সেই সড়কটির অবস্থা এতই শোচনীয় যে ৩০ কিলোমিটার যেতে ১০-১৫ ঘণ্টা লেগে যায়।

ব্যবসায়ী নেতারা শিল্পের জন্য জমিসংকটের কথাও বললেন। পর্যটন এলাকা বলে যত্রতত্র শিল্পকারখানা করা যায় না। সে জন্য সরকারের উচিত পর্যটন কেন্দ্রগুলো রক্ষা করে শিল্পের জন্য জমির বন্দোবস্ত করা। সরকার হবিগঞ্জের বাহুবলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা করেছে। কিন্তু সেখানে শিল্প করার অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এখনো নেই। সেটি কবে হবে, সে বিষয়েও নিশ্চিত নন ব্যবসায়ীরা।

এই বেহাল সিলেট-ভোলাগঞ্জ সড়ক দিয়েই ৯০ শতাংশ পাথর পরিবহন করা হয়

সিলেটকে ঘিরে যে পর্যটনবলয় গড়ে উঠেছে তাতে পর্যটকদের আকর্ষণ করার উপায় কী? জবাবে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত একজন বললেন, সাম্প্রতিক কালে অনেকগুলো পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। আছে মনোমুগ্ধকর বেশ কিছু রিসোর্ট বা অবকাশ কেন্দ্র। এখন অনেকে কক্সবাজার-রাঙামাটি না গিয়ে সিলেটে আসেন। কিন্তু সমস্যা হলো যোগাযোগ। রাস্তায় নামলেই তাঁরা দুর্ভোগে পড়েন। এ ছাড়া পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নেই। ফলে চুরি, ছিনতাই, চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটে। এ অবস্থায় একজন পর্যটক এত সব ঝক্কি-ঝামেলা করে কেন আসবেন?

আমি জিজ্ঞেস করি, অভিযোগ আছে সিলেটের মানুষ কারখানা না বানিয়ে ভবন বানান। প্রত্যুত্তরে সিলেট চেম্বারের এক পরিচালক বললেন, ভবন বানানোর কারণ আছে। এতে কোনো ঝুঁকি নেই। জমি ও ভবনের দাম কমে না। কিন্তু শিল্প করতে গেলে পদে পদে বাধা। গ্যাস-সংকটের কারণে সিলেট অঞ্চলে বহু ছোট ও মাঝারি কারখানা উৎপাদনে যেতে পারছে না। সরকার ২০০৯ সালে গ্যাস-সংযোগ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। পরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সংযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহীর নেতৃত্বে কমিটি করলেও সেটি খুব কাজে আসেনি। জ্বালানি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এই কমিটি সারা দেশে এক হাজার প্রতিষ্ঠানকে গ্যাস-সংযোগ দেওয়ার সুপারিশ করলেও কর্যকর হয়েছে খুবই কম।

সিলেটের ব্যবসায়ীদের দাবি, সরকার অবকাঠামোগত সমস্যা দূর করলে, গ্যাস-বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করলে নতুন শিল্পকারখানা গড়ে উঠবেই। তাঁদের আক্ষেপ হলো, সিলেটে বিপুল পরিমাণ গ্যাস উৎপাদিত হলেও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হয়নি। বিদ্যুৎ থাকলেও সঞ্চালন লাইন খারাপ। দিনে অন্তত দু-তিন ঘণ্টা লোডশেডিং থাকে। সিলেটে দুটো ওষুধ কারখানা আছে। আলাপ প্রসঙ্গে একটি কারখানার স্বত্বাধিকারী তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বললেন, এখানে কারখানা চালানোর দক্ষ লোক পাওয়া যায় না। ঢাকা ছেড়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীরা আসতে চান না। কারখানার একটি যন্ত্র নষ্ট হলেও ঢাকায় নিয়ে যেতে হয়। এখানে মেরামতের সুযোগ নেই।

সিলেটের ব্যবসায়ীরা মনে করেন, নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ছে। ওখানে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা আছে। কিন্তু বাংলাদেশের অংশে সড়কগুলো এত খারাপ যে পণ্য আনা-নেওয়া কঠিন। নাজুক যোগাযোগব্যবস্থা ও অপ্রতুল অবকাঠামোর কারণে অনেক স্থলবন্দর অকেজো পড়ে আছে। স্থলবন্দরে ওয়েব হাউস না থাকায় রোদ ও বৃষ্টিতে পণ্য নষ্ট হয়। এর বাইরে যেসব সমস্যার কথা তাঁরা বললেন, তার মধ্যে রয়েছে ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদের হার। এখনো ১২-১৪ শতাংশ হারে ঋণ নিতে হয়। তাঁদের মতে, সুদের হার একক ডিজিটে আনা জরুরি। এটি অবশ্য সারা দেশেরই সমস্যা।

ব্যবসায়ী নেতারা কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'সিলেটের মানুষ দেয় বেশি, পায় কম।' কীভাবে? তাঁরা বললেন, সিলেট অঞ্চলের মানুষই সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স পাঠান। তাঁরা কর-ভ্যাট বেশি দেন। কিন্তু সেই তুলনায় সরকারের উন্নয়নকাজ তেমন হচ্ছে না। বললাম, অর্থমন্ত্রী সিলেটের সন্তান। তাঁকে সমস্যাগুলো জানিয়েছেন কি না? তাঁরা বললেন, 'হ্যাঁ, জানিয়েছি। একাধিকবার তাঁর সঙ্গে বসেছি। তিনিও সমস্যাগুলো জানেন। কিছু কিছু সমাধানের চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু আমলাতন্ত্র সহজে নড়ে না।'

সিলেটে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার তথা শিল্পায়নের জন্য সরকার কী করতে পারে? তাঁরা বললেন, 'আমরা পুঁজি চাই না। চাই নীতি-সহায়তা। অবকাঠামোর উন্নয়ন ও গ্যাস-বিদ্যুতের নিশ্চয়তা।' তাঁদের দাবি, অবিলম্বে ঢাকা-সিলেট সড়ক চার লেন করতে হবে। সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে সত্যিকার অর্থে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে হবে। এখন মাত্র একটি বিমান বাইরে থেকে সরাসরি সিলেটে আসে। কিন্তু এখান থেকে কোনো আন্তর্জাতিক ফ্লাইট যায় না; ঢাকা হয়ে যায়।

ব্যবসায়ী নেতাদের দাবি, সিলেট-চট্টগ্রাম সরাসরি রেল সার্ভিস চালু করতে হবে। যেমনটি হয়েছে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে। চট্টগ্রাম-সিলেট বিমান সার্ভিস চালু করা দরকার। একই সঙ্গে তাঁরা সিলেট-গুয়াহাটি বিমান সার্ভিস চালুর দাবিও জানান। তাঁদের মতে, এটি চালু হলে কেবল সিলেটবাসী নন, সীমান্তবর্তী ভারতের নাগরিকেরাও লাভবান হবেন। গুয়াহাটি অনেক দূরের বলে তাঁরা সিলেট বিমানবন্দর ব্যবহার করতে আগ্রহী।

আলোচনায় আসে ঢাকা-সিলেট-গুয়াহাটি বাস সার্ভিসও। তাঁরা জানান, বর্তমানে সপ্তাহে এক দিন বাস চালু আছে। রাস্তাঘাটের বেহাল দশার কারণে মানুষ যেতে ভয় পায়। কয়েক বছর আগেও তামাবিল-শিলং কিংবা শিলং-গুয়াহাটি সড়কটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কিন্তু এখন দুটো সড়কই মসৃণ ও প্রশস্ত। ভারত অসমতল পাহাড়ি এলাকায় যদি এ রকম রাস্তা করতে পারে, বাংলাদেশ পারবে না কেন?

ব্যবসায়ী নেতারা সিলেটে শিল্পায়নের যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি প্রবাসীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা দাবি করেন। তাঁরা মনে করেন, ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা সত্ত্বেও সীমান্তবর্তী এলাকায় শিল্পকারখানা গড়ে উঠলে উত্তর-পূর্ব ভারতে রপ্তানি অনেক বাড়বে। কেননা বাংলাদেশের ওপর দিয়ে পণ্য নিলেও তার পরিবহন ব্যয় যা বাড়বে, এখানে উৎপাদিত পণ্য তার চেয়ে কম পড়বে। প্রাণ-আরএফএল সেই নজির স্থাপন করেছে। অন্যরা পারবে না কেন?

আগামীকাল : **সিলেটে রাজনীতি আছে, রাজনীতি নেই**

● **সোহরাব হাসান : কবি, সাংবাদিক।**
sohrabhassan55@gmail.com

সম্পাদক : মতিউর রহমান; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ; মুদ্রণ ও পরিবেশনা : দার আল শারক (ফরেন পাবলিকেশন্স), পোস্ট বক্স : ৩৪৮৮, ডি রিং রোড (লুলু হাইপারমার্কেটের পাশে), দোহা, কাতার
Editor: Matiur Rahman; Printed & Distributed by: Dar Al Sharq (Foreign Publications), P O Box: 3488, D Ring Road (Next to Lulu Hypermarket), Doha, Qatar, Phone: +974 44650 600, Fax: +974 44657198, Email: editorfp@daralsharq.net

জার্নি বাই প্লেন!

সময়চিত্র

আসিফ নজরুল

বিমানবন্দরে প্রবাসী শ্রমিকসহ অনেক যাত্রীকেই দুর্ভোগে পড়তে হয়

'প্লেন অমন নাচে ক্যান রে ভাই! রাস্তা কি উচা-নিচা নাকি রে!'

মালয়েশিয়া এয়ারলাইনসের বোয়িংয়ে আমরা তখন। তিনি বসে আছেন জানালার পাশে। মাঝে একটা খালি সিটের পরেই আমি। আড়চোখে দেখি তাঁকে। পাকা চুল, চোখেমুখে রাজ্যের ক্লান্তি। বয়স্ক লোকটা এমন রঙ্গ করে কথাগুলো বললেন কাকে! আশেপাশে তাকিয়ে কিছু বুঝতে পারি না। তিনি এখন ফুর্তিতে পা নাচাচ্ছেন, চোখ বন্ধ করে আছেন। তাঁর ক্লান্ত মুখে হালকা হাসি, তার মানে তিনি ভয় পাচ্ছেন না একদম।

মেঘের ধাক্কায় প্লেন থরথর করে কাঁপছে এখনো। আমার আশেপাশে যাঁরা আছেন, এই টার্বুলেন্স তাঁদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। তাঁরা হইহই করে উঠছেন, 'ভয় পাইছস নাকি রে' বলে নিজেরা হাসাহাসি করছেন। আমি তাঁদের দেড় দিনব্যাপী সফরের প্রাণচাঞ্চল্য দেখে অবাক হই। মালয়েশিয়া এয়ারলাইনসের কেবিন ক্রুরা বিরক্ত হন কি না, ভয়ে ভয়ে ভাবি।

একটু আগে কথা বলে জেনেছি, এঁরা অধিকাংশ মরিশাস থেকে ফিরছেন দেশে। মরিশাস থেকে সিঙ্গাপুরে নয় ঘণ্টা ফ্লাইট, সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়া সাড়ে তিন ঘণ্টা, মালয়েশিয়া থেকে এখন তাঁরা ফিরছেন ঢাকায়।

ঢাকাগামী প্লেন মানেই বিমানভর্তি বাংলাদেশি প্যাসেঞ্জার। সবচেয়ে পুরোনো, সবচেয়ে ধ্যারধ্যারে একটা প্লেন হবে সেটা, বিমানবালারা হবেন নির্দয়, খাবার থাকবে শুধু এক রকম, না চাইলে হার্ড ড্রিংকস দেওয়াই হবে না, সিটের পেছনে থাকবে না কোনো হেডরেস্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া আছে এয়ারপোর্টে, প্লেনে ওঠার সময় এবং ওঠার পরে এয়ারলাইনস-কর্মীদের তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার। মধ্যপ্রাচ্যের এয়ারলাইনগুলোর তুলনায় মালয়েশিয়ান এয়ারলাইনে কম তা। কিন্তু মরিশাস থেকে আগতরা যেভাবে হইহুল্লোড় করছেন, তাতে না খেপে যায় এঁরা!

২.

আমার এসব খেয়াল করার কথা না তখন। প্লেনে উঠলে আমি সিনেমা দেখব। দেখবই। তরুণ বয়সে মেঘ আর অপার্থিব আলো দেখে কাটত সময়। এখন সিনেমা। যাত্রাপথে *থিব* নামে জর্ডানিয়ন একটি ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। মাত্র কিছুদিন আগে *উলফ টোটেম* নামে একটি ফ্রেঞ্চ-চায়নিজ ছবিতে মঙ্গোলিয়ার মালভূমি, মানুষ আর নেকড়ে দেখে মঙ্গোলিয়া যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছি; *থিব* দেখে মরুভূমি দেখার। প্লেনের খাবার খেয়েদেয়ে মুগ্ধ হওয়ার মতো এমনই কোনো ছবি খোঁজার কথা আমার! কিন্তু আমি অবাক হয়ে হাজার হাজার মাইল দূরে আফ্রিকার অনেক নিচের মরিশাস দ্বীপপুঞ্জ থেকে আসা তরুণদের দেখি। এত দূরে যায়, এত মানুষ; বাংলাদেশ থেকে!

আমি একবার মাসকাট এয়ারপোর্টে বিশাল পলিথিনের পোঁটলা কোমরে ঠেকিয়ে কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক দীনহীন নারীকে দেখে কেঁদে ফেলেছিলাম। এঁদের অবস্থা অবশ্য কেঁদে ফেলার মতো নয়। কিন্তু তবু খারাপ লাগে আমার। শুকনো চোয়ালভাঙা অল্পবয়সী এই তরুণেরা কাজ করেন মরিশাসের বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন সাইটে; সেখানে সুউচ্চ ভবন নির্মাণের জন্য শ্রমিক হিসেবে। কেউ দুই বছর, কেউ তিন বছর পর দেশে আসার সুযোগ পেয়েছেন। বিমানভ্রমণ নিয়ে কোনো টেনশন বা চিন্তা নেই তাঁদের। টেনশন শুধু ঢাকা এয়ারপোর্ট নিয়ে। 'মাল' কি পৌঁছাবে ঠিকমতো ঢাকায়? কাস্টমস কি আটকে রাখবে কিছু? সবচেয়ে বড় টেনশন প্লেন যদি ঠিক সময়ে না পৌঁছায়; বাস না পেলে গভীর রাতে কোথায় থাকবেন তাঁরা?

আমি একটা জাপানি ছবি দেখি কয়েক মিনিট। ট্রাভেল শো কয়েক মিনিট। কিছুই ভালো লাগে না। এমনকি ডি-ক্যাপ্রিওর বহুলপ্রশংসিত ছবি *দ্য রেভেন্যান্ট*-এও মন বসাতে পারি না। মালয়েশিয়ান এয়ারলাইনের ক্রু দুপ্রস্থ কাগজ ধরিয়ে দিয়ে গেছেন সবাইকে। একটা ঢাকায় এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশনের জন্য, একটা কাস্টমসের জন্য। আমার পাশের যাত্রী কাস্টমসের চার পাতার ফরম উল্টেপাল্টে অশ্লীল গালি দেন একটা। বলেন, 'এক পোঁটলা জিনিস, বিবরণ দিতি হবি ১০ পাতা!'

তাঁর পেছনের একজন আরও বিপাকে পড়েছেন এসব ফরম নিয়ে। তাঁকে উদ্ধার করছেন আমার পাশের যাত্রী। তিনি পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে বলছেন, 'পিতার নাম কী রে, হিলাল?' হিলাল পেছন থেকে কিছু একটা বলেন। সেটি কি 'কবীর উদ্দিন' না 'খবিরুদ্দিন' তা নিয়ে কিছুক্ষণ হাস্যরস চলে। কিছু একটা লিখে পার্শ্বযাত্রী আরও জোরে প্রশ্ন করেন, 'মাতার নাম কী রে, হিলাল!'

কাস্টমসের ফরমের মায়ের নামও লিখতে হয় নাকি! আমি অবাক হয়ে সামনের সিটের পেছনে অবহেলায় গুঁজে রাখা কাগজ বের করে দেখি, ঠিক তাই! সেখানে এমনকি গত পাঁচ বছরে কোন কোন দেশ ভ্রমণ করেছেন, তারও বিবরণ চাওয়া হয়েছে! পার্শ্বযাত্রীটি হিলালকে বলেন, 'তুই গেলি কেবল মইরশাস! তোরও আবার বিবরণ!'

এ বছর আমি যে দেশগুলোতে গেছি (জার্মানি, কোরিয়া, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা) কোথাও কি কাস্টমসে এমন বিশদ বিবরণ দিতে হয়? ভেবে আমি অবাক হই; ম্যানিলায় নামার সময় তো এমনকি ইমিগ্রেশনের কোনো ফরমও পূরণ করতে হয়নি। মেশিন রিডেবল পাসপোর্টেই তো থাকার কথা সবকিছু। তাহলে আমাদের এত বৃত্তান্তের বালাই কেন! বিদেশে আমাদের শ্রমিক ভাইদের একটা বিরাট অংশ অল্পশিক্ষিত, কেউ কেউ হয়তো অশিক্ষিতও। তাঁদের জন্য কি যে আতঙ্ক আর ভোগান্তি সৃষ্টি করে এসব নিয়মকানুন! আমার চট করে মনে পড়ে, আমাদের বিমানমন্ত্রী না শ্রমিকদের রাজনীতি করতেন, তাঁদের কখনো মনে হয় না এসব!

৩.

আমাদের ফ্লাইট পৌঁছাবে গভীর রাতে। রোজার সময়ের গভীর রাত! তার ওপর ম্যানিলায় আমার হ্যান্ড লাগেজের ওজন দুই কেজি বেশি হওয়ায় বিমানের কার্গোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ঢাকায় লাগেজ পাওয়ার দুঃসহ প্রতীক্ষা আমাকেও করতে হবে! আমি বিরসমুখে ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ করতে গিয়ে কলম চাই পার্শ্বযাত্রীর কাছ থেকে। তিনি কলম দেন। আমার ফরম পূরণ হওয়ামাত্র তাঁরটাও বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'ইটাও করি দ্যান।' আমি অবাক হয়ে বলি, 'আপনি না পারেন!' 'আরি!' তিনি তাঁর মাথার পাশে অর্ধচন্দ্রাকারে আঙুল ঘুরিয়ে বলেন, 'মাথা ধরি যায়!'

আমি তাঁর পাসপোর্ট দেখে নাম লিখি, 'তমিজুদ্দিন!' জন্মসাল ১৯৭৭। হতবাক হয়ে দেখি তাঁকে আরেকবার, 'এই বৃদ্ধ-ভাঙচুরের বয়স ৩৯!'

তমিজুদ্দিন মা-বাপ তুলে গালিগালাজ করেন এসব প্রসঙ্গ তুললে। তাঁকে মরিশাসে নেওয়া হয়েছিল ১০ ঘণ্টা খাটানোর কথা বলে। খাটানো হয়েছে ১৪ ঘণ্টা করে। কোনো ওভারটাইম দেওয়া হয়নি। কোনো দিনই বেতন বাড়ানো হয়নি। তিনি গেছেন নির্মাণশ্রমিক হিসেবে। সেখানে মরিশাসের মালিক মেশিনের খরচ বাঁচান বাঙালি শ্রমিককে দিয়ে ভারী মালামাল বহন করিয়ে। তমিজুদ্দিন কোমরে হাত রেখে মোচড় খান একটু, তাঁর কোমরে তীব্র ব্যথা। এই ব্যথা নিয়ে কাজ করতে পারেন না আর ঠিকমতো। ১৩ মাস কাজ করে '৫০' বছর বয়স বেড়ে গেছে তাঁর!

তমিজুদ্দিন ও আশেপাশের আরও কয়েকজন আমাকে শ্রোতা পেয়ে উগরে দেন নিজেদের। বাঙালি শ্রমিক হলে কম বেতন, বিনা টাকায় ওভারটাইম, লাথি-জুতো! অন্য দেশের শ্রমিকদের সঙ্গেও এ রকম ব্যবহার করা হয় না কেন? তমিজুদ্দিন অবাক, 'কিবা করবে? ইন্ডিয়ান এম্বাসি আছে না! এমন ঠ্যালা দেবে না!'

ভারতের শ্রমিকের জন্য দূতাবাস আছে; পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা—সবারই তাই আছে। বিদেশবিভুঁইতে বাংলাদেশের মানুষের জন্য কেবল নেই কেউ। তমিজুদ্দিনের কথা সত্যি হলে সেখানে দূতাবাস নামে কিছু একটা আছে বটে, কিন্তু তারাও বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে খারাপভাবে ছাড়া কথা বলে না। কখনো কখনো টাকা ছাড়া কাজ করে না, কখনো তো আবার কোনো কাজই করে না। মরিশাসের মালিককে ঠ্যালা দেবে বাংলাদেশের এম্বাসি! 'ওরে, ওরে!' বলে তমিজুদ্দিনরা আরও এক পশলা হাসেন।

তমিজুদ্দিন দুবাই গিয়েছিলেন আগে। সেখানে মালিক এত খারাপ ছিলেন না। আট বছর কাজ করে তাঁর কিছু পয়সাপাতি হয়েছিল। তাহলে আবার তিনি মরিশাস গেলেন কেন? তমিজুদ্দিন আমার পীড়াপীড়িতে হঠাৎ লাজুক হয়ে যান। জানান, তাঁর মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছিল। বাপ বিদেশে চাকরি করে শুনলে ভালো ছেলে পাওয়া যায়। তমিজুদ্দিনের মেয়ের তাই হয়েছে। জামাই সিটি করপোরেশনের পিয়ন। ভালো ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয়েছে, আর বিদেশে পড়ে থাকা কেন! তমিজুদ্দিন মধুরভাবে হাসেন, 'কিছু একটা নিয়ে দেশেই বসি পড়ব এখন!'

আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি তাঁকে! এই না বাংলাদেশের মানুষ; বাংলাদেশের বাবা! মেয়ের বিয়ে হওয়ামাত্র তমিজুদ্দিন মালিকের নামে মরিশাসে কি একটা অফিসে অভিযোগ করেছেন। মালিক তাঁকে বকেয়া পরিশোধ না করে শুধু প্লেনের টিকিট ধরিয়ে বিদায় করে দিয়েছেন। তাঁর পকেটে এখন ২৬ ডলার মাত্র! সেটা নিয়ে তিনি বাস পেলে মাগুরা যাবেন। না পেলে তাঁর কিছু একটা উপায় করতে হবে! কিন্তু তাঁর প্রধান টেনশন এখন লাগেজ নিয়ে। মেয়ের জন্য কী কী সব কিনেছেন। সেগুলো যদি 'মারি' দেয় এখন!

৪.

গভীর রাতে ঢাকা এয়ারপোর্টে বসে আছি। লাগেজ আর আসে না, আসে না! শূন্য কনভেয়ার বেল্টের দিকে আরও শূন্য চোখে তাকিয়ে আছেন লোকজন। কী কী সব ব্যাজ লাগানো লোকজন ঘোরাঘুরি করছেন আশেপাশে! আসল লোক আর আসেন না।

একটু দূরে চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছি। বিবিসি স্পোর্টস ওয়েবলিংকে চোখ বোলাচ্ছি। হঠাৎ শুনি উল্লাসধ্বনি। কনভেয়ার বেল্ট অবশেষে ঘুরতে শুরু করেছে। আমাদের 'মুখ্য-সুখ্য' শ্রমিকেরা তাতেই খুশি। তাঁদের টাকা লুটপাট করে আমরা তাঁদেরই দিই অনিশ্চিত মধ্যরাত। তবু তাঁরা খুশি!

আমি দূরেই বসে থাকি। তমিজুদ্দিনের মতো মহামূল্যবান কিছু নেই আমার লাগেজে। তাঁর লাগেজ এসেছে। দুই হাত ওপরে তুলে এখন আনন্দ করছেন তিনি।

এই নোংরা শহরে এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর কী হতে পারে!

● **আসিফ নজরুল: অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।**

হাতি ঘোড়া গেল তল...

বাজেট

শাহদীন মালিক

আদালত ও বিচার বিভাগের ভাগ্যে বাজেটের শতকরা ১ ভাগও জোটেনি

রোজা-রমজানের এই মাসে মহান সংসদ সংগত কারণেই বিকেল-সন্ধ্যার পরিবর্তে সকাল-দুপুরে আলোচনায় বসেছে। ইফতারের আগেই নিত্যকার আলোচনা শেষ হয়েছে। রাতে টেলিভিশনের খবরে অথবা পরের দিন পত্রপত্রিকায় মহান সংসদের আলোচনার কিছু অংশ 'সংবাদ' হয়ে দর্শক-পাঠকের গোচরীভূত হয়েছে।

মাসটা 'বাজেটের'। বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদে যা এসেছে, তা-ই সংবাদমাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন হয়েছে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে 'বাজেট আলোচনা' চোখে পড়েনি। অর্থাৎ অমুক মন্ত্রণালয়ের তমুক খাতে কেন এত টাকা বরাদ্দ করা হলো অথবা তার উল্টো, অর্থাৎ এত কম টাকা কেন ইত্যাদি গোছের প্রশ্ন বা বিতর্ক খুবই কম হয়েছে। হলেও চোখে পড়েনি বা সংবাদমাধ্যমগুলো গুরুত্বসহকারে প্রচার করেনি।

অগত্যা অধমকে বাজেট আলোচনায় নিমজ্জিত হতে হলো। অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আমদানি-রপ্তানিকারক, করদাতা, আদায়কারী প্রতিষ্ঠানসহ বাজেট-প্রক্রিয়ায় বহু বছর ধরে জড়িত সবার কাছে 'গোস্তাখি মাফ' চেয়েই অধমের বয়ান!

এক.

পাঠক! পাই-পয়সা হিসাবের দরকার নেই। এই লেখার সংখ্যাগুলো বড় দাগের। যেমন ৯৮৭ কোটি ৫৪ লাখ ৮২ হাজারের বদলে বলেছি বড় দাগে ১ হাজার কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বড় দাগের ৩ লাখ ৪০ হাজার কোটি (চৌত্রিশের পর শূন্য ১১টা!) টাকার বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতার পর সবচেয়ে বড় খাতের পরিমাণ হলো ৩৯ হাজার ৯৫১ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই খাতে বরাদ্দ হলো বাজেটের প্রতি ১০ টাকায় ১ টাকারও বেশি। অন্য কথায়, শতকরা ১০ ভাগের বেশি বরাদ্দ এই খাতে। কিন্তু কী আশ্চর্য। কোনো মন্ত্রী নেই, অন্তত সরাসরি আছেন বলে তো আমরা শুনিনি। থাকলে নাম নিশ্চয় হতো 'সুদমন্ত্রী'। হ্যাঁ, খাতটা হলো সুদ। আগামী অর্থবছরে সুদ বাবদ সরকারকে ব্যয় করতে হবে ৩৮ হাজার কোটি টাকা।

ভাবুন। অতীতে ও বর্তমানে সরকার কী পরিমাণ অর্থ ধার নেয়, যার শুধু সুদের পরিমাণই আসছে বছরে ৩৮ হাজার কোটি টাকা। কোন সরকার কোন বছর কত হাজার কোটি টাকা ধার নিয়েছে, কী কাজে সে টাকা ব্যয় করেছে, এসব অবান্তর প্রশ্ন সাংসদেরা করেন না। অধমও সে ঝুট-ঝামেলায় জড়াতে চায় না। তবে নিবেদন ছোট—প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা তো, তাই একজন মন্ত্রী থাকলে ভালো হতো। সম্ভবত খোদ অর্থমন্ত্রীই এই হাজার হাজার কোটি টাকা দেখভাল করেন। তা-ও বলছি, একজন মন্ত্রী থাকলে লাখ লাখ কোটি টাকা ধার নেওয়া আর হাজার হাজার কোটি টাকা শুধু সুদ পরিশোধের ব্যাপারটা আরও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা যেত।

দুই.

'সুদমন্ত্রী'র ব্যাপারটা আরও যৌক্তিক হবে, যদি আমরা হোমরাচোমরা সব মন্ত্রীর বাজেট বরাদ্দের দিকে নজর ফেরাই।

নিঃসন্দেহে তোফায়েল আহমেদ, আমির হোসেন আমু, রাশেদ খান মেনন বড় বড় মন্ত্রী। বা ছিলেন লতিফ সিদ্দিকী। কী না হইচই হলো তাঁর নিউইয়র্কের একটা বক্তব্যকে ঘিরে। ছিলেন বড় মন্ত্রী। মন্ত্রণালয় ছিল বস্ত্র ও পাট। মন্ত্রী থাকলে আসছে অর্থবছরে তাঁর মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ থাকত ৪২৫ কোটি টাকা।

রাশেদ খান মেননের বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ৫৪৯ কোটি টাকা। বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের মন্ত্রণালয়ের জন্য জুটেছে ৫৫২ কোটি টাকা। আর ইনু সাহেবের তথ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য ৮৩৬ কোটি টাকা। 'বাকের ভাই'খ্যাত আসাদুজ্জামান নূরের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় পাবে ৪২১ কোটি টাকা। আর আরেক বড় মন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তাঁর হিসাবে না-ইবা গেলাম। এসব বড় মন্ত্রী যোগ করলে যা, তার 'ডাবল' হলেন মুজিবুল হক। পাঠক, বুঝলেন না কোন মন্ত্রী? রেলমন্ত্রী। ছিলেন চিরকুমার সংগঠনের বড় নেতা। পেলেন মন্ত্রিত্ব। ছাড়লেন 'চিরকুমারত্ব'। বাজেট

আসছে বছরে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা। মন্ত্রণালয় বটে।

ওবায়দুল কাদের দেখা যাচ্ছে কথায় ও কাজে বড় মন্ত্রী। তাঁর মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। মারহাবা! 'সুদ মন্ত্রণালয়' থেকেও বড় একটা মন্ত্রণালয় আছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা মিলিয়ে—অবশ্য দুটো মেলালে বাজেট প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। টাকা খরচ করলেই শিক্ষা হয় না। হলে সব ব্যাটা বড়লোকের ছেলেমেয়েরা ভীষণভাবে উচ্চশিক্ষিত হয়ে যেত। ইদানীং এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া ছেলেমেয়েদের প্রায় অর্ধেকই হয়তো আমাদের (বাংলাদেশের) রাষ্ট্রপতির নাম জানে না। নেপালের রাজধানীর নাম জানা তো অনেক দূরের ব্যাপার।

তিন.

আসল কথায় আসি। আগামী বছর সুপ্রিম কোর্টের উন্নয়ন বাজেট গোল্লা, অর্থাৎ শূন্য অর্থাৎ এক টাকাও বরাদ্দ নেই। অনুন্নয়ন বাজেট ১৫৫ কোটি টাকা। বিচারপতি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ঝাড়মোছ অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়মিত অন্যান্য কাজ—এসব মিলিয়ে ১৫৫ কোটি টাকা।

সুপ্রিম কোর্টের বিচার মানের এতই তুঙ্গে উঠে গেছে যে এর উন্নয়নের জন্য কোনো অর্থের প্রয়োজন অন্তত আগামী বছর আর দরকার হবে না। তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেল, আগামী অর্থবছরে নতুন কোনো বিচারপতি বোধ হয় শপথ নেবেন না। নতুন বিচারপতি নিয়োজিত হলে তাঁর জন্য গাড়ি তো লাগবে। গাড়ি কিনতে হলে বাজেট বরাদ্দ লাগবে। নতুন গাড়ির জন্য বরাদ্দ থাকার কথা উন্নয়ন বাজেটে। সেটা যেহেতু শূন্য, অতএব নতুন গাড়ি নেই। অথবা নতুন বিচারপতিও নেই। অবশ্য অবসরে যাওয়া বিচারপতির পুরোনো গাড়ি দিয়ে যদি নতুন বিচারপতিকে আনা-নেওয়া করা যায়, তাহলে ভিন্ন কথা।

আইনের আরেকটা প্রতিষ্ঠান আছে, যার বরাদ্দ ১৮ কোটি টাকা। উন্নয়ন বরাদ্দ—পাঠকের ধারণা সঠিক—শূন্য। বছরে ১৮ কোটিকে ১২ দিয়ে ভাগ করলে মাসে দাঁড়ায় দেড় কোটি টাকা। অ্যাটর্নি জেনারেল, অ্যাডিশনাল অ্যাটর্নি জেনারেল। ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেলদের নিয়ে সাকল্যে বর্তমানে ১৪৭ জন। সঙ্গে কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে মাসিক বরাদ্দ দেড় কোটি টাকা।

মাঝেমধ্যে সংবাদমাধ্যমে খবর আসে যে শত শত এমনকি হাজার হাজার কোটি টাকার কর আটকে গেছে হাইকোর্টের মামলার বেড়াজালে। এসব কর মামলার ঝামেলা মিটিয়ে সরকার কর আদায় করতে পারছে না। করের মামলা ছাড়াও বছরে যত দিন হাইকোর্ট খোলা থাকে, তার প্রতিটি দিনে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় অন্তত শ-তিনেক। সরকারের হয়ে প্রতিদিনের এই শ-তিনেক মামলাও ঠেকাতে হয় মাসিক দেড় কোটি টাকার অফিসকে। ১৪৭ জনের মধ্যে গাড়ি বরাদ্দ আছে সাকল্যে চারটি। অবশ্য পাঁচ-ছয়টাও হতে পারে। সম্বল ওই পর্যন্তই। 'সম্বল মোর কম্বলখানি'—এটা বলারও জো নেই। আর সরকার বলে, দেশে নাকি আইনের শাসন আছে। নদীতে মাছ নেই, গোলায় ধান নেই—বলে মাছে-ভাতে বাঙালি।

কলিকালে আরও কত কিছু শুনব।

চার.

আসি আদালতে। উন্নয়ন বরাদ্দ ৪৭৪ কোটি টাকা, যার সিংহভাগ খরচ হবে বিভিন্ন জেলায় আদালত ভবন নির্মাণে। এটা ভালো উদ্যোগ।

পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে নেই, মাস তিনেক আগে খবর এসেছিল পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যে মগবাজার-মালিবাগ উড়ালসড়কের কিছু সংশোধনী প্রয়োজন। উড়ালসড়কটির এক অংশ আধা কিলোমিটার বাড়িয়ে এফডিসি পর্যন্ত আনা হবে। নির্মাণকাজ শেষ হবে আগামী জুনে। এই বর্ধিত আধা কিলোমিটার উড়ালসড়ক ও সংস্কারের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ যোগ করা হয়েছিল কমবেশি ৪৫০ কোটি টাকা। পদ্মা সেতুর জন্য ঢাকা-মাওয়া চার লেনের মহাসড়কের প্রতি কিলোমিটারে বর্তমান হিসাবমতে খরচ হবে ১১৩ কোটি টাকা। ১৬০ মিটার, অর্থাৎ ৩০০ হাত রাস্তার নির্মাণ খরচ দিয়ে চলে অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস, আর সুপ্রিম কোর্টের জন্য বরাদ্দ দেড় কিলোমিটার মহাসড়কের নির্মাণ বরাদ্দের চেয়েও কম। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বাজেট হাজার হাজার কোটি টাকা, তার তুলনায় মাননীয় প্রধান বিচারপতির জন্য বরাদ্দ ছিটেফোঁটা বাড়ালেই মামলার জট ছুটে যাবে নিমেষেই আর আদালতগুলোর প্রক্ষালনকক্ষে আমরা আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীরা যেতে পারতাম নাক না চেপেই।

হায়রে কপাল!

বহু বছর ধরেই আদালত ও বিচার বিভাগের ভাগ্যে বাজেটের শতকরা ১ ভাগের অর্ধেকও জোটেনি। দেশের মোট বাজেট ১০০ টাকা হলে বিচার বিভাগ পায় ৩০ থেকে ৪০ পয়সা। এটা বাড়িয়ে ১০০ টাকায় ৫০ পয়সা বিচার বিভাগকে দিলে হয়তো ভালো হতো। নিশ্চিতভাবে ভালো হতো যদি বর্ধিত বরাদ্দের পুরোটাই আগামী পাঁচ বছর ধরে বিচার বিভাগের সঙ্গে জড়িত—বিচারপতি, বিচারক, আইনজীবী, কর্মকর্তা, কর্মচারী—সবার মান উন্নয়নে। অর্থাৎ মানবসম্পদ উন্নয়নে।

গাড়ির ব্যাপারে আগে যা বলেছি, সেটা সম্পূর্ণ সঠিক হয়তো নয়, কারণ অনুন্নয়ন বাজেট থেকেও গাড়ি কেনা যায়, কিন্তু জানামতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুপ্রিম কোর্টের উন্নয়নের জন্য কোনো প্রকল্প নেই, কোনো বরাদ্দও নেই।

পাঠক! আয়কর, ভ্যাট, আমদানি-রপ্তানি কর, জমিজমার কর, হোল্ডিং ট্যাক্স, সারচার্জসহ হরেক কিসিমের ট্যাক্স সারা বছরই দিয়ে যান। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আমার-আপনার কাছ থেকে সারা বছরে আদায় করে নেবে দুই লাখ কোটি টাকার বেশি। কিন্তু বিচার চাইতে পারবেন না।

● **ড. শাহদীন মালিক : আইনজীবী, সুপ্রিম কোর্ট। শিক্ষক, আইন বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক।**

গুণীজন কহেন

ইতিহাসের চেয়ে কবিতা আত্যন্তিক সত্যের বেশি কাছাকাছি

প্লেটো
(গ্রিক দার্শনিক)

অপরিণত কবি অনুসরণ করে, আর পরিণত কবি করে চুরি

টি এস এলিয়ট
(মার্কিন কবি)

কবিতা হচ্ছে সেরা শব্দের সেরা সমাহার

এস টি কোলরিজ
(ইংরেজ কবি)

ভালোবাসাই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও বেসবল তার চেয়েও একটু বেশি ভালো।

ইয়োগি বেরা
মার্কিন ক্রীড়াবিদ

শব্দভেদ

১		২		■	৩	৪	
	■		■	৫			■
৬						■	৭
	■	■	■		■	৮	
■	৯	১০	১১		১২	■	
■	১৩			■		■	
১৪		■	১৫			■	
১৬				■	১৭		

বাঁ থেকে ডানে
১. ঈশ্বরবিষয়ক। ৩. দরজার পাল্লা। ৫. বংশপরম্পরা। ৮. এক প্রকার গুটিকাযুক্ত জ্বর রোগ। ৯. অপরিপক্ব। ১৩. অসন্তুষ্ট। ১৪. খাদ্য। ১৫. হাঁস। ১৬. খরগোশের মতো অত্যন্ত ব্যস্ত। ১৭. মশা।

ওপর থেকে নিচে
১. হাতি। ২. এক প্রকার ত্রিচক্রযান। ৩. পা। ৪. প্রান্ত। ৫. হামলা। ৭. একই সময়ের। ৯. অমরত্ব। ১০. অনাত্মীয়। ১১. সহায়-সম্বলহীন। ১২. সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ বাংলা শব্দ। ১৪. হিন্দু বৈদ্য বংশের একটি পদবি।

তৈরি করেছেন : **মেসবাহ খান,** রাজপাট, মাগুরা।

গত সংখ্যার সমাধান

স	চে	ত	ন	■	স	চি	ত্র
ম	ত	■	দ	শ	ক	■	স্ত
বা	না	ন	■	ক	ল	ম	■
য়	■	বা	■	ট	■	স	দা
■	অ	ন্ন	■	■	দা	ন	■
স	ন্ত	■	মো	■	■	দ	র
বু	■	স	হ	চ	র	■	হি
জ	গ	ৎ	■	ন্দ্র	■	দাঁ	ত

বেসিক আলী

শাহরিয়ার

আপনার রাশি

কাজী এস হোসেন

যাঁরা এই সাত দিনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের জন্য বিশেষ শুভ সংখ্যা ১ ও ৪। শুভ রত্ন—গোমেদ ও মুক্তা। শুভ রং—হালকা সবুজ, হলুদ, ও ধূসর। এবার জেনে নেওয়া যাক ১২টি রাশিতে এ সপ্তাহের পূর্বাভাস :

মেষ (২১ মার্চ-২০ এপ্রিল)
সপ্তাহের শুরু থেকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করবে। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে এ সপ্তাহে বিদেশ থেকে সম্মাননা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দূরের যাত্রা শুভ।

বৃষ (২১ এপ্রিল-২১ মে)
ব্যবসায়ে নতুন বিনিয়োগ আশার সঞ্চার করবে। এ সপ্তাহে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। পাওনা আদায়ে অন্যের সহযোগিতা পেতে পারেন। দূরের যাত্রা শুভ। প্রেমে সাফল্যের দেখা পাবেন।

মিথুন (২২ মে-২১ জুন)
চাকরিতে কারও কারও কর্মস্থলে পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। মামলা-মোকদ্দমা থেকে দূরে থাকুন। এ সপ্তাহে বাড়িতে বিশিষ্ট মেহমানের আগমন ঘটতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে।

কর্কট (২২ জুন-২২ জুলাই)
সপ্তাহের শুরু থেকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করবে। শিক্ষার্থীদের কারও কারও বিদেশে অধ্যয়নের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হতে পারে। ব্যর্থ প্রেমের সম্পর্কে নতুন সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। দূরের যাত্রা শুভ।

সিংহ (২৩ জুলাই-২৩ আগস্ট)
ফাটকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্য সপ্তাহজুড়েই সুসময় বিরাজ করবে। পাওনা আদায়ের জন্য সপ্তাহের শুরু থেকেই উদ্যোগ নিন। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য সপ্তাহজুড়েই সুসময় বিরাজ করবে। দূরের যাত্রা শুভ।

কন্যা (২৪ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর)
সপ্তাহজুড়েই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করবে। মামলা-মোকদ্দমার রায় আপনার অনুকূলে যেতে পারে। এ সপ্তাহে বাড়িতে বিশিষ্ট মেহমানের আগমন ঘটতে পারে। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন।

তুলা (২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর)
ব্যবসায়িক যোগাযোগ শুভ। এ সপ্তাহে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। প্রেমের ব্যাপারে ভুল-বোঝাবুঝির অবসান হতে পারে। সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের জন্য বিদেশ থেকেও সম্মাননা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বৃশ্চিক (২৪ অক্টোবর-২২ নভেম্বর)
কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপনাকে তাঁর ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। কোনো আইনি সমস্যার সমাধান হতে পারে। ফেসবুকে কারও সঙ্গে প্রেমের সূচনা হতে পারে। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন।

ধনু (২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর)
চাকরিতে কারও কারও বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আপনার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারেন। এ সপ্তাহে হঠাৎ করেই হাতে টাকাপয়সা চলে আসতে পারে। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

মকর (২২ ডিসেম্বর-২০ জানুয়ারি)
এ সপ্তাহে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তেজিভাব বিরাজ করতে পারে। সামাজিক কাজে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে। কোনো অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন।

কুম্ভ (২১ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি)
বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সুযোগ ফিরে আসতে পারে। প্রেমবিষয়ক জটিলতার অবসান হবে। এ সপ্তাহে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। সৃজনশীল কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন।

মীন (১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ)
ব্যবসায়িক লেনদেনে আপনার স্বার্থ অক্ষুণ2 থাকবে। সৃজনশীল পেশায় আপনার সুনাম অন্যের ঈর্ষার কারণ হতে পারে। ফেসবুকে কারও সঙ্গে প্রেমের সূচনা হতে পারে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হবে।

জোছনা ও জননীর গল্প

হুমায়ূন আহমেদ

কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) জয় করেছিলেন লাখো পাঠকের মন। প্রবাসী পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় একটি উপন্যাস

পর্ব : ১৮

সে রাতে টিভি অনুষ্ঠান শেষ হবার পর পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত 'পাক সার জমিন শাদ বাদ' ঠিকই বাজানো হয়েছে, কিন্তু পাকিস্তানি পতাকা দেখানো হয়নি। লক্ষণ ভালো না। লক্ষণ খুবই খারাপ। পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী এত কিছু দেখার পরেও চুপ করে থাকবে, কিচ্ছু বলবে না—তা হতেই পারে না। ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে তো বটেই। সেটা কবে ঘটবে?

বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করছে না। কী করা যায়? কী করা যায়? নাইমুলের কাছে গেলে কিছুটা সময় কাটে। সে বিয়ে করেছে—এই খবরটা পেয়েছে। বিয়ের পর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। নাইমুলকে যে মেয়ে বিয়ে করেছে, সে খুবই ভাগ্যবতী। এই খবরটা মেয়েকে দিতে ইচ্ছা করছে। শাহেদ ঠিক করল, নাইমুলকে পেলে তাকে নিয়ে সে তার শ্বশুরবাড়ি যাবে। নাইমুলের স্ত্রীকে বলবে, ভাবি, কী অসাধারণ একটি ছেলেকে আপনি স্বামী হিসেবে পেয়েছেন জানেন না। আমি জানি। নাইমুল অনেক তুচ্ছ জিনিস নিয়ে আপনার সঙ্গে রাগারাগি করবে। আপনাকে বিরক্ত করবে। সব আপনি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করে দেবেন। কারণ এই ছেলে খাঁটি হীরা। তার মধ্যে কোনো ভেজাল নেই। আপনি যদি চান, আপনাকে লিখিতভাবে দিতে পারি।

নাইমুলকে পাওয়া গেল না। ঘর তালাবদ্ধ। তবে তালার সঙ্গে সেঁটে দেয়া একটা ছোট্ট চিরকুটে লেখা—

যার জন্যে প্রযোজ্য

কিছুদিন ঘরজামাই জীবনযাপন করছি। আমার নতুন ঠিকানা—১৮নং সোবাহানবাগ (দোতলা), মিরপুর রোড। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন আমার কাছে না আসে।

শাহেদ নোট পড়ে হাসল। মনে মনে ঠিক করল, আসমানীর রাগ ভাঙিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যার পর উপস্থিত হবে নাইমুলের শ্বশুরবাড়িতে।

শাহেদ বাসায় ফিরল দুটোর দিকে। কাঁচাবাজার ছাড়াই ফিরল। কী কী লাগবে তার লিস্ট আসমানীর কাছ থেকে নেয়া হয়নি। তবে সে ছটা হাতি মার্কা খাতা কিনল। একবাক্স রং-পেনসিল কিনল। আসমানীর রাগ ভাঙানোর জন্যে সে কিনল একটা রাগভাঙানি-শাড়ি। শাড়ির রং অবশ্যই আসমানী। রাজশাহী সিল্কের শাড়ি। শাড়ি হাতে নিলেই আসমানীর রাগ অনেকখানি কমবে। শাড়ির সঙ্গে লেখা নোটটা পড়লে এতটুকু রাগও থাকবে না। নোটে লেখা—'জানো গো! কেন এমন করো?'

বাসায় তালা দেওয়া। শাহেদ এতে তেমন বিস্মিত হলো না। তার মনে ক্ষীণ আশঙ্কা ছিল, বাসায় ফিরে এ রকম কিছু সে দেখবে। ঘরে তালা দিয়ে আসমানী রাগ করে চলে যাবে কলাবাগানে তার মা'র কাছে।

আসমানী কলাবাগানে ছিল না। শাহেদের শাশুড়ি বিরক্ত গলায় বললেন, শহরের অবস্থা এত খারাপ, এর মধ্যে আসমানী বের হলো কেন? রোজ রোজ কী নিয়ে তোমাদের এত ঝগড়া? আমি আমার মেয়ের ওপর যেমন রাগ করছি, তোমার ওপরও রাগ করছি। এখন যাও তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করো ও কোথায়। তুমি তো বাবা আমাকে মহা-দুশ্চিন্তায় ফেললে। শহরের অবস্থা এত খারাপ, এর মধ্যে এই খবর...

শাহেদ নানান জায়গায় ওদের খুঁজল। কোনোরকম সন্ধান পাওয়া গেল না। শাড়িটা সে রেখে এসেছে তার শাশুড়ির কাছে। এটা নিয়েও সে দুশ্চিন্তা করছে। শাশুড়ি যদি নোটটা পড়ে ফেলেন, তাহলে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে। রাত অনেক হয়েছে। ঘড়ি নেই বলে কত রাত তা বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তাঘাটে লোক-চলাচল একেবারেই বন্ধ। রিকশাও চলছে না। কিছুদূর পরপরই রাস্তায় এমন ব্যারিকেড দেওয়া, রিকশা চলার প্রশ্নই আসে না।

শাহেদ হেঁটে হেঁটে ফিরছে, এই সময় শহরে মিলিটারি নামল। রাতটা হলো ২৫ মার্চ, ১৯৭১।

আকাশে ট্রেসার উড়ছে। আকাশ আলো হয়ে উঠছে। তৈরি হচ্ছে আলোর নকশা। যেন বারবার কালো আকাশে ঝলমলিয়ে উঠছে উৎসবের হাউই বাতি। তারাবাতির মতো আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে মেশিনগানের মুখ থেকে। বাজির শব্দের মতো গুলি। উৎসব। অন্য ধরনের উৎসব। হত্যা ও ধ্বংসের উৎসব। এই উৎসবের জন্যে কেউ কি তৈরি ছিল? ঢাকার ঘুমন্ত মানুষ ভয়াবহ আতঙ্ক নিয়ে জেগে উঠল। কী হচ্ছে? কী হচ্ছে?

সবাই জানে কী হচ্ছে। তারপরেও যেন কেউ কিছু জানে না। ভারী মিলিটারি ট্রাক, মিলিটারি জিপ অবলীলায় রাস্তায় চলাচল করছে। সব কটি রাস্তায় না ব্যারিকেড ছিল? এরা এত দ্রুত ব্যারিকেড সরাল কীভাবে? অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে রাস্তায়। ট্যাংক নেমেছে নাকি? ট্যাংক চললে রাস্তায় এমন অদ্ভুত শব্দ হয়? একটানা যে ট্যা ট্যা শব্দ হচ্ছে, সেই শব্দ কিসের? তার চেয়েও বিচিত্র আরেক ধরনের শব্দ হচ্ছে—শোঁ শোঁ হুস হুইইই।

ভয় এবং কৌতূহল বোধ হয় পাশাপাশি চলে। প্রচণ্ড ভীত মানুষের কৌতূহলও হয় প্রচণ্ড। এরা জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়েছে। দেখতে চেষ্টা করছে কী হচ্ছে বাইরে। কেউ কেউ চলে এসেছে বারান্দায়। চোখের সামনে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ দেখার আলাদা মাদকতা আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একধরনের ঘোর তৈরি হয়। মাথার ভেতরে জগাখিচুড়ির মতো কিছু হয়। তখন মানুষ যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন সব কাণ্ড করে।

এই জাতীয় কাণ্ড কিছু শুরু হলো। কিছু কিছু নিতান্তই নিরীহ ছাপোষা ধরনের মানুষ 'জয় বাংলা, জয় বাংলা' বলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাল। দীর্ঘ আন্দোলনে এদের কেউ হয়তো কোনোদিন রাজপথে নামেনি। কোনো স্লোগান দেয়নি। অফিসে গিয়েছে, অফিস থেকে ফেরার পথে বাজার করে নিয়ে এসেছে। চটের ব্যাগের ভেতর থেকে উঁকি দিয়েছে একটা লাউ, ইলিশ মাছের লেজ। আজ হঠাৎ তাদের কী হয়ে গেল?

ভীত মানুষের কান্না ও চিৎকার শোনা যেতে শুরু করল তারও কিছু পরে। আকাশে তখন ট্রেসারের সংখ্যা কমে এসেছে। কারণ তার প্রয়োজন নেই। সারা ঢাকা শহর আলোকিত। অসংখ্য জায়গায় আগুন জ্বলছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া। আগে সারা শহরে একসঙ্গে গুলি হচ্ছিল, এখন তা হচ্ছে না। গুলি হচ্ছে অঞ্চলবিশেষে।

টেলিফোন কাজ করছে না। রাস্তা শুধু যে জনশূন্য তাই নয়, প্রথমবারের মতো কুকুরশূন্য। কোথায় কী হচ্ছে কেউ জানতে পারছে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কী হলো? তাঁর আঙুলের ইশারায় দেশ চলছিল। এখন তিনি কিছু বলছেন না কেন? ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেষ বৈঠকের আগে, সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ভালো কিছু আশা করছি। খারাপ কিছুর জন্যেও প্রস্তুত আছি। কোথায় তাঁর প্রস্তুতি? নাকি যুদ্ধ শুরু হয়েছে, কেউ কিছু জানে না।

একদল মিলিটারি ঢুকে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। তাদের হাতে শিক্ষকদের তালিকা। তারা মানুষ না, তারা সাক্ষাৎ আজরাইল। মানুষের বেশে জান কবজ করতে এসেছে।

এটা কার বাড়ি? জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট? হিন্দু মালাউন? বদমাশটার নাম কী? জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা?

১. মিলিটারি লেফটেন্যান্ট বাড়িতে ঢুকে পড়ল। জোয়ানরা বাড়ি ঘিরে আছে। হতভম্ব জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন।

আপ প্রফেসর সাব হ্যায়?

Yes.

আপকো লে যায়গা।

Why?

হোয়াই প্রশ্নের জবাব দেবার সময় নেই। তাঁকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাঁর স্ত্রী বাসন্তী গুহঠাকুরতা, তাঁর অতি আদরের কন্যা দোলা তখনো বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে। এর বেশি কী হবে? খালি পায়ে স্বামীকে নিয়ে যাবে? বাসন্তী গুহঠাকুরতা দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন স্যান্ডেল আনতে। এর মধ্যেই জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে বাইরে নিয়ে গুলি করা হয়েছে।

তাদের বসার ঘরের সঙ্গেই চিৎ হয়ে পড়ে আছে ড. মনিরুজ্জামানের মৃতদেহ। একটু দূরে আরও তিনজন। একজন ক্ষীণস্বরে বলছে, পানি পানি।

মারা গেলেন দার্শনিক আত্মভোলা অধ্যাপক ড. জি সি দেব। জি সি দেব মৃত্যুর আগে প্রায় হাসিমুখে বললেন, আমি হিন্দু। আমার বাড়িতে যারা আছে সবাই হিন্দু।

২. তিনি হয়তো ভাবলেন, সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি কোনো অত্যাচার করা হবে না। কিংবা অন্য কিছু তখন তাঁর মাথায় খেলা করছিল।

মারা গেলেন মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ফজলুর রহমান, ফলিত পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান ড. মনিরুজ্জামান, ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল মুকতাদির, অঙ্ক বিভাগের অধ্যাপক শরাফত আলী, পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এম আর খান খাদিম, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক মুহম্মদ সাদিক ও ড. মুহম্মদ সাদত আলী।

মিলিটারিরা ঢুকে পড়ল ইকবাল হল এবং জগন্নাথ হলে। তাদের পরিকল্পনা একটি ছাত্রও যেন জীবিত বের হয়ে যেতে না পারে। তোমাদের 'জয় বাংলা' অনেক সহ্য করেছি। আর না।

রোকেয়া হল এবং শামসুন্নাহার হল। মেয়েদের দুটি হল। হলের মেয়েরা আতঙ্কে অস্থির হয়ে দেখল, গেট ভেঙে মিলিটারিরা ঢুকছে। 'আমাদের বাঁচাও' বলে চিৎকার করার মতো মানসিক শক্তিও তাদের রইল না। তারা দেখল, পাকিস্তানি জোয়ানরা মার্চ করে হলের দিকে এগুচ্ছে।

সেনাবাহিনী আগুন জ্বালিয়ে দেয় ইত্তেফাক অফিসে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে দি পিপলস, গণবাংলা এবং সংবাদ অফিসে। আত্মনিমগ্ন কবি শহীদ সাবের সংবাদ অফিসেই ঘুমাতেন। সংবাদ অফিসই ছিল তার ঘরবাড়ি। তিনি জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেলেন সংবাদ অফিসেই।

পাকিস্তান মিলিটারি রাত একটায় যে অপারেশন শুরু করে তার নাম 'অপারেশন সার্চলাইট'।* ব্রিগেডিয়ার আরবাবের ৫৭ ব্রিগেড ছিল ঢাকা অপারেশনের দায়িত্বে। অধিনায়ক মেজর জেনারেল ফরমান আলি। তিনি শায়েস্তা করবেন ঢাকা নগরী। মেজর জেনারেল খাদেমের ওপর দায়িত্ব পড়ল ঢাকা ছাড়া বাকি দেশ শায়েস্তা করার।

ব্রিগেডিয়ার আরবাব ১৮ পাঞ্জাব, ২২ বেলুচ এবং ৩২ পাঞ্জাবের যৌথ দলকে লেলিয়ে দিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে পাঠাল রাজারবাগের এক হাজার পুলিশকে জন্মের শিক্ষা দেবার জন্যে।

পুরোনো ঢাকার গাদ্দারদের শায়েস্তা করবে ১৮ পাঞ্জাব।

২২ বেলুচের দায়িত্ব পড়ল পিলখানা ইপিআরদের ঠাণ্ডা করার।

১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে কোনো কাজে লাগানো হলো না। রিজার্ভ বাহিনী হিসেবে তাদের ক্যান্টনমেন্ট এলাকাতে রেখে দেওয়া হলো।

৪৩ হালকা বিমান বিধ্বংসী রেজিমেন্টকে পাঠানো হলো তেজগাঁও বিমানবন্দরের দায়িত্ব দিয়ে।

এক প্লাটুন কমান্ডো পাঠানো হলো ধানমন্ডি ৩২ নম্বর থেকে শেখ মুজিবকে ধরে আনতে।

রাত একটায় ওয়্যারলেসে ৫৭ ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার মেজর জাফরের উৎফুল্ল কণ্ঠ ভেসে এল Big Bird in the cage...others not in the nests. ...over.

সামরিক বাহিনীর জিপে করে তাঁকে নিয়ে আসা হলো ক্যান্টনমেন্টে। মেজর জাফর জানতে চাইলেন জেনারেল টিক্কা কি তাঁকে চোখের দেখা দেখতে চান? টিক্কা উত্তর দিল I don't want to see his face.*

জেনারেল টিক্কা ২৫ মার্চ রাত নটায় ঢাকা অঞ্চল কমান্ডার মেজর জেনারেল ফরমান আলির স্টাফ অফিসে ঢাকা অপারেশনের দায়িত্বে নিযুক্ত অফিসারদের হাসতে হাসতে বলেছিলেন—ঢাকা শহরে এমন তাণ্ডব তৈরি করতে হবে যেন আতঙ্কে দুগ্ধবতী মাতার বুকের দুধ জমে দই হয়ে যায়। বাংলাদেশ ছোট্ট একটি দুষ্ট প্রাণী। ঢাকা হলো সেই প্রাণীর মাথা। আমরা শুধু মাথাটা ভেঙে গুঁড়ো করে দেব। আমাদের আর কিচ্ছু করতে হবে না। ২৭ মার্চ ভোরবেলা আমি কারফিউ তুলে দেব। দেখা যাবে ২৭ মার্চেই ইনশাল্লাহ দেশ ঠিক হয়ে গেছে।

জেনারেল টিক্কা পরম সৌজন্যে টি-পট থেকে নিজেই সবার জন্য চা ঢেলে দিলেন। হাসিমুখে বললেন, শেক্সপিয়ার তাঁর হ্যামলেটে বলেছিলেন, I have to be cruel only to be kind. আমার ক্রুয়েলটি হবে একধরনের দয়াপ্রদর্শন। বাঙালিদের প্রতি দয়া। গ্যাংগ্রিনে আক্রান্ত অংশ শল্যচিকিৎসক কেটে বাদ দেন। তিনি তা করেন রোগীর মঙ্গলের জন্য, রোগী তা বুঝতে পারে না। রোগগ্রস্ত বাঙালিকে আমরা বাঁচাব না তো কে বাঁচাবে?

মিটিংয়ের শেষ পর্যায়ে তিনি পাঞ্জাবি সৈন্যদের বুদ্ধি-সুদ্ধি নিয়ে একটা রসিকতা করলেন। সেই রসিকতায় এক একজন হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ল। একজন জেনারেলের সামনে এভাবে হাসা বড় ধরনের বেয়াদবি, কিন্তু না হেসে পারা যাচ্ছিল না। রসিকতাটা ছিল বড়ই মজার।

জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে ভুট্টোর সাক্ষাৎ হলো গভর্নর হাউসে। ততক্ষণে অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয়ে গেছে। ভুট্টো খানিকটা উত্তেজিত। অস্থির। তার জানার আগ্রহ, কী হচ্ছে? অপারেশন কোন পর্যায়ে? জেনারেল টিক্কা খান তাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছে না। মিলিটারি অপারেশন কী হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে তা সিভিলিয়ানদের জানানোর কিছু নেই। উত্তেজিত ভুট্টো রাতেই মিলিটারি কনভয়ের সঙ্গে বের হয়ে শহরের অবস্থা দেখতে আগ্রহী। জেনারেল টিক্কা হাসি হাসি মুখে বলল, No. ভুটেটা মেঝেতে জুতা ঠুকে বলল, Why no?

জেনারেল টিক্কা বলল, Because I said no.

ভুট্টো বলল, আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

টিক্কা বলল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেছেন। তিনি এখন পাকিস্তানের পথে।

ভুট্টো আবারও মেঝেতে জুতা ঠুকে বলল, এই তথ্যটা আমি কেন জানলাম না? আমিও তো তাঁর সঙ্গে চলে যেতে পারতাম।

আপনাকে রেখে যাওয়া হয়েছে বিদ্রোহী পূর্ব পাকিস্তানের শান্ত রূপ দেখে যাবার জন্যে। অখণ্ড পাকিস্তানের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী, কফি খাবেন?

'সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী' সম্বোধনে ভুট্টোকে খানিকটা তুষ্ট মনে হলো।

লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ -এর রিপোর্টার সিমন ড্রিংয়ের পাঠানে প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য ঢাকা থেকে পাঠানো প্রথম বিদেশি প্রতিবেদন।

ক্রমশ

অলংকরণ : মাসুক হেলাল

যে যেভাবে দেখে

হিন্দি সিরিয়াল দেখছেন, হঠাৎ করে একটা দৃশ্যে আটকে গেল আপনার চোখ। সেই দৃশ্য দেখে আপনি কী ভাবেন? আচ্ছা, আপনারটা পরে দেখা যাক, অন্যরা কী ভাবে তা-ই দেখে নেওয়া যাক।

লেখা : **মোস্তফা মনোয়ার**

তরুণ নাট্যনির্মাতা

এই দৃশ্যে ক্যামোগ্রাফি আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল। নায়িকার চেহারা এখানে ঠিক ক্লিয়ার না। আর ক্যামেরার এই অ্যাঙ্গেলের কারণে দৃশ্যের কনট্রাস্টও ভালোভাবে ফুটে ওঠেনি। এ ছাড়া ব্যাকগ্রাউন্ডটাও কেমন যেন বেমানান লাগছে। এ রকম বাজেট পেলে এর চেয়ে আরও অনেক সুন্দর দৃশ্য আমি উপহার দিতে পারতাম দর্শকদের।

বামপন্থী রাজনীতিবিদ

এভাবেই টিভি চ্যানেলে প্রলেতারিয়েতরা অবহেলিত হয়ে আসছে যুগে যুগে! তারা কেবল টিভিতে দেখাবে বুর্জোয়া, পুঁজিপতি শ্রেণির মিলনের দৃশ্য। প্রলেতারিয়েতদের দুঃখের-হতাশার কোনো ছাপ এখানে নেই। এই সিরিয়ালগুলো আমাদের এক ইউটোপিয়ায় নিয়ে গেছে। এভাবে চলতে পারে না। সমাজের সব শ্রেণির দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-সুখ দেখাতে না পারলে কীভাবে হবে!

ফ্যাশন ডিজাইনার

নায়কের শেরওয়ানি আর নায়িকার এই ড্রেসটা তো খুবই সুন্দর! এবার ঈদে এটাকে বাজারে কাপল ড্রেস হিসেবে নামিয়ে দেওয়া যাবে। কাপল ড্রেসের নাম হবে 'পশুপাখি ড্রেস'।

সিরিয়ালভক্ত তরুণী

ওএমজি! নায়কটা কত্ত কিউট! আর নায়িকাটার ড্রেসটাও জোশ! এবার ঈদে আমার এ রকম একটা লাগবেই লাগবে।

সিরিয়ালভক্ত তরুণ

যে যা-ই বলুক না কেন, সিরিয়াল যেমনই হোক, নায়িকাটা অনেক সুন্দর। আর নায়কের হেয়ার স্টাইলটাও খারাপ না। দেখি, সেলুনে গিয়ে এই কাটটা দিয়ে আসব।

ডেকোরেটরের মালিক

ঘরের ডেকোরেশনটা কেমন জানি, পর্দাগুলো এমন মলিন কেন? পেছনের সবই তো দেখা যায়, তাইলে আর পর্দা দিয়া লাভ হইল কী? আর নায়িকার পাশে এটা কেমন একটা স্ট্যান্ড দিয়া রাখছে? কেনই-বা দিয়া রাখছে?

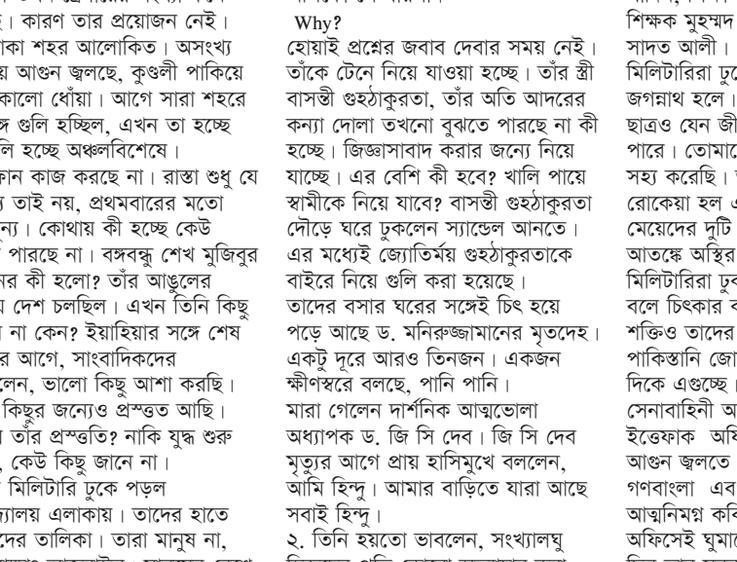

অলংকারের দোকানের মালিক

নায়িকার হাতে যে প্যাঁচাইন্না ব্রেসলেটটা দিছে, সেইটা দেখতে খারাপ না। তয় আমারও কইলাম এর চাইতে ভালো ডিজাইনের ব্রেসলেট আনছি। যা-ই হোক, জিনিসটা ভালোই। এবারের ঈদে এমন একটা ডিজাইন নামানো যায়।

আর্কিটেক্ট

ঘরের ইন্টেরিয়র ডিজাইনটা আরও ভালো হতে পারত। নায়কের পেছনের দেয়ালে ও রকম ফুটো রাখার মানে খুঁজে পেলাম না। এর মধ্য দিয়ে তো আর আলো-বাতাস ঢুকবে না! আর্কিটেকচার জিনিসটা এত সোজা না! না বুঝে না শুনে একটা কিছু করলেই আর্ট হয় না। মনে রাখতে হবে, আর্কিটেকচার একটা আর্ট।

বাঙালির শর্টকোর্স-প্রীতি

গ্রন্থনা : **আবু সাঈদ**
আঁকা : **শিখা**

আজকাল রাস্তাঘাটে চলার উপায় নেই। যেদিকে তাকাই, সেদিকেই দেখি 'তিন দিনে ইংরেজি শিখুন', 'পাঁচ দিনে রকমারি রান্না শিখুন', 'এক ঘণ্টায় ৩০টি জাদু শিখুন', 'ড্রাইভিং শিখুন গাড়ির স্টিয়ারিং না ধরেই'! আরও কত কিছু যে শর্টকোর্সের মাধ্যমে শেখানো হচ্ছে, তার প্রমাণ তো পাচ্ছেন আমাদের কোমলমতি শিশু-কিশোর, তরুণ শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের পরীক্ষা দেখে। এভাবে আর কত?

আসুন, একটা শোনা গল্প আবার শুনি নতুন করে।

বিল গেটস লাইবেরিয়ায় নতুন অফিস খুলেছেন। সেখানে দক্ষ একজন লোক দরকার। সারা দুনিয়ার অগণিত মানুষ আবেদন করেছেন সেই পদটার জন্য। কেউ কারও থেকে কম নন। বিল গেটস চাইছিলেন সব প্রার্থী উপস্থিত থাকুক। সে জন্য টিএডিএর ব্যবস্থাও করেছিলেন তিনি। তো সবাই উপস্থিত হলেন সেখানে।

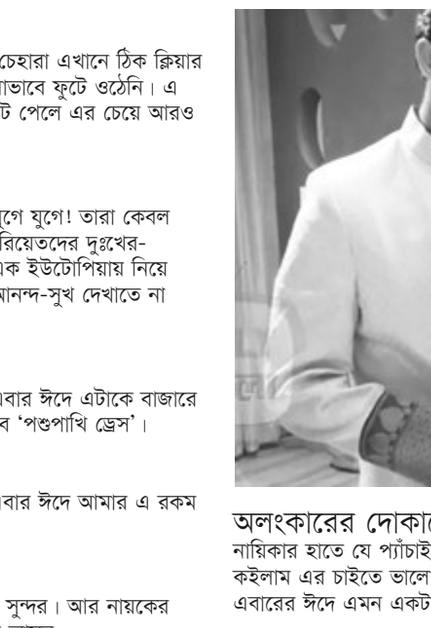

প্রথমে মাইকে ঘোষণা করা হলো, যাঁরা প্রোগ্রামিং পারেন না, তাঁরা চলে যান। দেখা গেল, অর্ধেকই প্রোগ্রামিং পারেন না। সেখানে একজন বাঙালিও ছিলেন। তিনি ভাবলেন, 'এ আর এমনকি! শর্টকোর্স করে শিখে নেওয়া যাবে!' তাই তিনি থেকে গেলেন। এরপর বিল গেটস বিভিন্ন অ্যাপলিকেশনের বিষয়ে জানতে চাইলে দেখা গেল আস্তে আস্তে প্রার্থী কমতে কমতে মাত্র অল্প কজন বাকি আছেন।

বিল গেটস তখন বললেন, 'যাঁরা লাইবেরিয়ার ভাষায় কথা বলতে পারেন, তাঁরা বাদে বাকিরা চলে যান।' দেখা গেল, দুজন বাদে সবাই চলে গেছেন। সেই দুজনের মধ্যে বাঙালি ভাইটাও ছিলেন। তিনি মনে মনে আগের মতোই ভাবলেন, 'এ আর এমনকি! শর্টকোর্স করে শিখে নেব।'

বিল গেটস দেখলেন, আর মোটে দুজন প্রার্থী আছেন। এবং দুজনই সব যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু তাঁর মাত্র একজন দরকার। তাই তিনি ঘোষণা করলেন, 'আপনারা দুজন লাইবেরিয়ার ভাষায় কথা বলুন।'

বাঙালি দমবার পাত্র নন। তিনি খাঁটি বাংলায় বলে উঠলেন, 'ভাই, আমার নাম সবজান্তা শমশের। আপনি ভালো আছেন তো?' আমাদের বাঙালি সাহসী ভাইকে অবাক করে দিয়ে ওপাশ থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, ভালো আছি। আমার নামও সবজান্তা ষমশের; তবে শমশের বানানে আমি মূর্ধণ্য ষ লিখি। তো আমি ভালো আছি।' এরপর দুই বাঙালি অনর্গল কথা বলতেই থাকলেন। বিল গেটস লাইবেরিয়ার ভাষা বুঝতেন না, বাংলা ভাষাও বোঝার কথা নয়। তাই তিনি ভাবলেন, বাহ্, এই দুজন কত সাবলীলভাবে লাইবেরিয়ার ভাষায় কথা বলছেন। শেষে সিদ্ধান্ত পাল্টে দুজনকেই নিয়োগ দিলেন তিনি।

এটা একটা কল্পিত গল্প। তবে বাঙালিরা শুধু কল্পনায়ই সেরা নন, সত্যিকার অর্থেও তাঁরা সেরা। তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তালিকা করলে সেটা বিশাল লম্বা হবে। এই যেমন শিক্ষাব্যবস্থার কথাই ধরুন। সবাই ছুটছেন শর্টকোর্সের পেছনে। তবে এভাবে শর্ট করতে করতে না জানি আমাদের শর্টসার্কিট হয়ে যায়!

■ **জাজাফী**

শুনলে মোদের হাসি পায় হাসতে গেলে কান্না পায়!

আঁকা : **নাইমুর রহমান**

কারাতে কন্যা অনিতার কথা

মায়ের সঙ্গে অনিতা

আহসান মাহমুদ

বয়স যখন মাত্র সাত বছর, রেহানা বেগম মেয়ে অনিতা শাম্মীকে ভর্তি করিয়ে দেন কারাতে শেখার স্কুলে। মা চেয়েছিলেন নিজের মেয়েকে গড়ে তুলবেন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, শক্ত একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। মেয়েরও আগ্রহের কমতি ছিল না। পড়াশোনার চাপ থাকলেও নিয়মিত চলত কারাতের চর্চা। যুক্তরাষ্ট্রের থমাস জেফারসন হাইস্কুল ফর সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনোলজি এবং ল্যাংলি হাইস্কুলে পড়ার সময় নিয়মিত চলত কারাতে চর্চা।

কারাতের নিয়মিত সেই চর্চাই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক অনিতা শাম্মীকে এনে দিয়েছে সাফল্য, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনেকগুলো শিরোপা। মা রেহানা বেগম যুক্তরাষ্ট্রের অরোরা সেন্ট লুকস মেডিকেল সেন্টারের স্ট্রান্সপ্ল্যান্ট হেপাটোলজিস্ট। মায়ের সঙ্গে বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছেন অনিতা শাম্মী। ঢাকায় নিকেতনে এক আত্মীয়ের বাসায় ২৭ জুন কথা হয় অনিতার সঙ্গে। এ সময় সেখানে তাঁর মা-ও ছিলেন।

রেহানা বেগম জানালেন, স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে অনিতা ভর্তি হন ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়ায়। পড়ার বিষয় বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং। স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছেন। এখন স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তির অপেক্ষা। অনিতা ভর্তি হবেন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ায়, বিষয় থাকছে আগেরটাই।

কথায় কথায় জানা হলো অনিতার কারাতে চর্চার নানা কিছু। তিনি মূলত যেটা চর্চা করেন সেটা 'এনশিন কারাতে'। জাপান থেকেই কারাতে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা পৃথিবীতে। সব দেশেই এ খেলা পরিচিত। অনিতা মাত্র ১১ বছর বয়সে কারাতের ব্ল্যাক বেল্ট অর্জন করেন। ব্ল্যাক বেল্ট অর্জনের পরও ১২টি ডিগ্রি থাকে কারাতে খেলায়। এগুলোতে কৌশল খাটাতে হয় আরও বেশি। অনিতা 'থার্ড ডিগ্রি' অর্জন করেছেন। এখন ফোর্থ ডিগ্রি অর্জনের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

কারাতে অনিতার প্রথম বড় মাপের সাফল্য আসে ২০১১ সালে। ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জেতেন অনিতা। পরের বছর ২০১২ সালেও চ্যাম্পিয়ন হন অনিতা। এদিকে ২০১২ সালে ডেনভারে ক্যাপিটাল সাবাকি চ্যাম্পিয়নশিপ নামের আন্তর্জাতিক কারাতে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন অনিতা। অ্যাডাল্ট উইমেন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হন এই তরুণী। চমকে দেন সবাইকে। এরপর গত মে মাসে অনুষ্ঠিত চলতি বছরের প্রতিযোগিতা পর্যন্ত টানা পাঁচ বছর শিরোপা হাতছাড়া হয়নি অনিতার। কারাতের জাপান চ্যাম্পিয়নশিপে অনিতা শাম্মীও চ্যাম্পিয়ন হন ২০১৩ ও ২০১৪ সালে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে কারাতে খেলায় এই মেয়েটির সাফল্যের ঝুলি বেশ ভারীই।

বাংলাদেশি কোনো মেয়ের কারাতে এমন সাফল্য নজিরবিহীন ঘটনাই বলা যায়। অনিতা জানান, ছোটবেলায় মায়ের ইচ্ছায় শুরু করলেও ধীরে ধীরে কারাতের প্রতি ভালো লাগা বাড়তে থাকে। এরপর একসময় কারাতের নানা নিয়ম মানতে গিয়ে জীবনের প্রতিটি সময়ই কারাতের জন্য উৎসর্গ করা হয়ে গেছে। অনিতা বললেন, 'আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এ রকম সাফল্য অর্জন করা আমার জন্য অনেক গর্বের। আমার খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, ব্যায়াম এমনকি অবসরও কাটে কারাতের নিয়ম মেনে। সকালে ঘুম থেকে ওঠা, রাতে ঘুমাতে যাওয়া—সবকিছুই একটি নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসতে হয়েছে। পড়াশোনাতেও প্রচুর সময় যায় আমার। তবে আমি কারাতেকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করি।'

পড়াশোনা আর কারাতের পাশাপাশি ঘুরতে পছন্দ করেন অনিতা। ছুটি পেলেই মা কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে বেড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন দেশে। এখন যেমন ঘুরছেন। অনিতা জানালেন, একেক দেশে গিয়ে সেই দেশের মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি দেখতে-বুঝতে ভালো লাগে তাঁর। আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার অনেক দেশ ঘুরেছেন অনিতা। সবচেয়ে বেশি পছন্দ তাঁর প্রিয় কারাতের জন্মভূমি জাপান।

অনিতার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। তবে বাংলাদেশে এর আগেও কয়েকবার এসেছেন। অনিতা বলেন, 'বাংলাদেশে এলে ভালো লাগে যখন দেখি আমাদের আত্মীয়স্বজন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সবার আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হই।'

স্নাতকোত্তর শেষে পুরোদমে কারাতের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তিনি। একটি জিমনেশিয়াম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা আছে তাঁর। অনিতা বাংলাদেশের নারীদের কারাতে খেলায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চান। জানালেন, এ জন্য কাজ করে যাবেন তিনি।

অনিতা শাম্মী

ওটস দিয়ে মজার রান্না

স্বাস্থ্যগুণ-সমৃদ্ধ ওটসের সঙ্গে পালন করুন পবিত্র রমজান। ওটস আঁশযুক্ত খাবার, যা কোলেস্টেরল কমাতে ও ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। প্রোটিনযুক্ত খাবার হওয়ায় তা সারাদিনের কাজে শক্তি জোগায়

ওটস ফ্রাইড চিকেন

উপকরণ

ম্যারিনেটের জন্য :
দেড় কেজি চিকেন, ২ কাপ বাটার মিল্ক, ১ টেবিল চামচ মিক্সড মসলা, ১/৪ চা চামচ জয়ফল গুঁড়া, ২টি রসুনের কোয়া কুচি কুচি করে কাটা, লবণ ও গোলমরিচ।
কোটিংয়ের জন্য :
৩ কাপ ওটস গুঁড়া, ১ চা চামচ আদা গুঁড়া, ১ চা চামচ পাপরিকা, ১/২ চা চামচ লবঙ্গ, ১/২ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া, লবণ ও গোলমরিচ।

প্রণালি

চিকেন ধুয়ে ৮ পিস করে কাটুন। শুকিয়ে নিন। ম্যারিনেট করার সকল উপকরণ মিশিয়ে নিন এবং চিকেনের সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিন। কভার করে ফ্রিজে অন্তত ২ ঘণ্টা রাখুন অথবা রাতভর রেখে দিন। ওভেনকে ১৮০ ডিগ্রি সে. গরম করুন। কোটিংয়ের সকল উপকরণ একটি বাটিতে মিশিয়ে নিন। ম্যারিনেট থেকে চিকেন পিসগুলো নিয়ে ওটস কোটিং-এ ডুবিয়ে নিন। তেলসহ প্যানে কোটেড চিকেন বিছিয়ে দিন। ওভেন ৩৫-৪৫ মিনিট বেক করুন। রান্না হয়ে যাওয়া চিকেন সারভিং ডিশ-এ পরিবেশন করুন। সার্ভ করার সময় সেলেরি, গাজর ও কেচাপ-এর সাথে পরিবেশন করুন।

ট্যাংগি টমেটো ওটস রাইস

উপকরণ

৩/৪ কাপ (৭৫ গ্রাম) রোস্টেড ওটস, আধা কাপ (৫০ গ্রাম) ব্রাউন রাইস, ১ চা চামচ মরিচের গুঁড়া, ২টি বড় টমেটো মিহি করে কাটা, ২টি মাঝারি টমেটো ৬ পিস করে কাটা, ২টি কাঁচা মরিচ কাটা (লম্বা করে), ২ চা চামচ লেবুর রস, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি

৬-৮ কাপ পানিতে সামান্য লবণ দিয়ে ৭-৮ মিনিট ধরে রাইস রান্না করুন, যেন রাইসগুলো ঝরঝরা থাকে। এরপর রাইসের মাড় আলাদা করুন। প্যানটি গরম করে নিন এবং টমেটো কুচিগুলো ৪-৫ মিনিট রান্না করুন। লবণ, মরিচের গুঁড়া ও কাঁচা মরিচ মিশিয়ে নিন। পিস করে কাটা টমেটো মিশিয়ে ১-২ মিনিট ধরে রান্না করুন। রোস্টেড ওটস ১-২ মিনিট ধরে মিশিয়ে নিন। এরপর রাইস মিশিয়ে নিন, লেবুর রস হালকাভাবে মিশিয়ে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

শিশুরা কতক্ষণ টিভি দেখবে

তৌহিদা শিরোপা

'বাচ্চাটাকে নিয়ে কী যে করি! সুযোগ পেলেই টিভি দেখতে বসে যায়। শুধু টিভির দিকে মন। পড়াশোনা করতে চায় না।' সন্তানদের নিয়ে মা-বাবার এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। তাই বলে তো শিশুর টিভি দেখা বন্ধ করা যাবে না। কেননা, শহরকেন্দ্রিক জীবনযাপনে ওদের বিনোদনের অল্প কিছু পথের মধ্যে ওরা টিভি বেছে নেয় খুব সহজেই। এটি পুরোপুরি ওদের দোষ নয়।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শিশুদের অবশ্যই টিভি দেখতে দিতে হবে। প্রতিদিন নিয়ম করে দুই ঘণ্টা টিভি সে দেখতেই পারে। এতে নেশা হয়ে যায় না। অনেক শিশুই স্কুল থেকে ফিরে টিভি দেখে। এটি নিয়েও মায়েরা রাগারাগি করেন। তাই সন্তানকে বুঝিয়ে বলতে হবে। গোসল করে খাওয়ার সময়ও টিভি দেখতে পারবে। তারপর সে বিশ্রাম নিতে যাবে। এ জন্য অভিভাবককে কৌশলী হতে হবে। বকা দিলে, সব সময় 'না' বললে শিশুর জিদ বেড়ে যেতে পারে। তখন লুকিয়ে টিভি দেখতে আগ্রহী হবে। পড়াশোনায় মনোযোগী হবে না।

শিশুরা সাধারণত কার্টুন দেখতে পছন্দ করে। সব কার্টুন ওরা দেখে না। ওদের পছন্দেরটা দেখতে চায়। তার বাড়ির কাজ, পড়াশোনা শেষ করলেই সেটি দেখতে পাবে। এমন অলিখিত চুক্তিতে যান। দেখবেন, সন্তান দ্রুত পড়া শেষ করেছে। তবে আপনি কথা রাখবেন। অনেক সময় অভিভাবকেরা কথা রাখেন না। এতে সন্তানেরা কষ্ট পায়, মা-বাবাকে বিশ্বাস করতে চায় না। এ ছাড়া টিভি থেকে দূরে রাখতে চাইলে ওকে খেলতে দিতে হবে। সময়মতো সবকিছু করার অভ্যাস তৈরি করুন। দেখবেন, শিশু নিজেই নিয়মমাফিক চলছে। এমনকি অতিরিক্ত টিভিও দেখছে না। ঢাকার জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক আহমেদ হেলাল বলেন, পড়ালেখা, খাবার খাওয়া—দৈনন্দিন কাজগুলোর ব্যাঘাত না করে টিভি দেখতে পারে। কিন্তু টিভিতে কী দেখছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কতক্ষণ টিভি দেখল তার থেকে। এমন কিছু যেন না দেখে, যাতে ওর মনোজগতে সমস্যা তৈরি হয়।

শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য বিনোদন জরুরি। তবে এটি যেন টিভিকেন্দ্রিক হয়ে না পড়ে। সারা দিনের সময়টা নিজের মতো করে ভাগ করে নিতে হবে। অভিভাবকেরাও সন্তানের সঙ্গে কথা বলে এটি তৈরি করতে পারেন। এতে করে সন্তানের মতামত প্রকাশ পাবে। সেখানে টিভি দেখার সময়টা অন্তর্ভুক্ত করে দিতে হবে। টিভি দেখা অভ্যাসের বিষয়। চাইলে সারা দিনও দেখা যেতে পারে। এ কারণে সন্তানকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিষয় দেখতে দিন। সে যেন তার উপযোগী অনুষ্ঠান দেখে। অনেক সময় তারা প্রাপ্তবয়স্কদের অনুষ্ঠান দেখতে শুরু করে। রাগ না করে পুরো বিষয়টি তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ টিভি দেখলে চোখে ক্লান্তি নেমে আসে। ঘুম পায়। পড়ার প্রতি শিশু আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আধা ঘণ্টার বেশি একনাগাড়ে টিভি দেখা উচিত নয়। তবে অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। সন্তানকে সময় দিতে হবে। ছুটির দিনগুলোতে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারেন। গল্পের বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করুন। দেখবেন, সে টিভি দেখার নেশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। স্কুল থেকেও এমনটি করা যেতে পারে। তারা উদ্যোগী হয়ে সপ্তাহে এক দিন শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির কাছে, দর্শনীয় কোনো ঐতিহাসিক স্থানে নিয়ে যেতে পারেন। এতেও শিশুদের একঘেয়েমি কাটবে। তারা পড়াশোনায় উৎসাহ পাবে। টিভি দেখবে। কিন্তু নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে না।

স্মার্টফোন কেনার আগে

স্মার্টফোন কেনার আগে যে বিষয়টা নিশ্চিত করা জরুরি সেটা হলো, এই যন্ত্র আপনার প্রয়োজন মেটাতে পারবে কি না। আপনার চাহিদা কী, তা আগে ঠিক করে নিন। সে অনুযায়ী একটা তালিকা করুন। নিচের বিষয়গুলো মাথায় রাখতে পারেন। এরপর বাজারে গিয়ে মিলিয়ে দেখুন নকশা আপনার রুচির সঙ্গে যায় কি না। যেহেতু প্রতিদিন কিংবা প্রতি মাসে কেনা সম্ভব নয়, তাই স্মার্টফোন কেনার আগে নিচের বিষয়গুলো মিলিয়ে দেখুন।

● **নেটওয়ার্ক**
স্মার্টফোন কেনার আগে দেখে নিন সেটা অন্তত থ্রিজি নেটওয়ার্ক সমর্থন করে কি না। দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ এবং ভিডিও কলের জন্য থ্রিজি থাকা জরুরি।

● **আকার**
এক হাতে কোনো স্মার্টফোন ব্যবহার করতে হলে তার আকার যতটা সম্ভব ছোট হওয়া ভালো। অন্যদিকে বড় পর্দার স্মার্টফোনের আকার এমনিতেই কিছুটা বড় হয়ে থাকে।

● **পর্দা**
রেজ্যুলেশন, পর্দার আকার, নিরাপত্তা এবং পর্দার ধরন—এ কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। বর্তমানে বড় পর্দার স্মার্টফোনের প্রতি তরুণদের একটা ঝোঁক দেখা যায়। ভালো মানের ভিডিও দেখতে হলে কমপক্ষে এইচডি (প্রস্থে ৭২০ পিক্সেল) হতে হবে।

● **অপারেটিং সিস্টেম**
স্মার্টফোনের মধ্যে পার্থক্য তৈরিতে এই একটি উপাদানই যথেষ্ট। অ্যান্ড্রয়েডের ক্ষেত্রে অনেক স্মার্টফোন থেকে বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে। বিভিন্ন দামের স্মার্টফোন পাওয়া যায়। আর অ্যাপও পাওয়া যায় অনেক বেশি। আইফোনে সাধারণত সব ভালো প্রতিষ্ঠানের অ্যাপ সবার আগে পাওয়া যায়।

● **প্রসেসর**
স্মার্টফোনে আপনি কী ধরনের কাজ করেন, তার ওপর ঠিক করে প্রসেসরের কথা ভাবতে হবে। খুব ভালো গেম বা অ্যাপ চালাতে দরকার ভালো প্রসেসর। একসঙ্গে অনেক কাজ বা মাল্টি-টাস্কিংয়ের জন্যও ভালো মানের প্রসেসর গুরুত্বপূর্ণ।

● **মেমোরি**
অতিরিক্ত মেমোরি কার্ড যোগ করার সুযোগ থাকলে তা কতটুকু, তা জেনে নিন। আর যদি সে সুযোগ না থাকে, তবে ইন্টারনাল মেমোরি যেন বেশি হয়, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

● **ক্যামেরা**
বর্তমানে সেলফি তোলার প্রতি মানুষের একটা ঝোঁক রয়েছে। আর তাই সামনের ক্যামেরাটা ভালো মানের হওয়া চাই।

● **ব্যাটারি**
দীর্ঘক্ষণ চলার জন্য বেশি মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি কিনতে হবে।

● **নকশা**
স্মার্টফোন এখন ফ্যাশনেরও অনুষঙ্গ। তাই ভালো নকশার স্মার্টফোন একদিকে যেমন স্টাইলিশ, অন্যদিকে কাজেও বেশ।

● **অনুষঙ্গ**
সব স্মার্টফোনের সঙ্গেই প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ দেওয়া হয়। তবে অতিরিক্ত কিছু যেমন কার চার্জিং, ব্লুটুথ, হেডসেট ইত্যাদি প্রয়োজন হলে কেনার সুযোগ আছে কি না, তা দেখে নিতে পারেন।

● **দাম**
সবকিছু মিলে গেলেও দামে না মিললে তা কেনা সম্ভব নয়। তাই বাজেটের কথা সবার আগে মাথায় রাখতে হবে।

● **বিক্রয়োত্তর সেবা**
বিক্রয়োত্তর সেবার মেয়াদ বেশি হওয়াটা জরুরি। এতে দীর্ঘদিন আপনার ফোনের সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে বিনা মূল্যে। স্যামসাং স্মার্টফোনে ১ বছর, এমনকি ব্যাটারির জন্যও ১ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা পাওয়া যাবে। অন্যদিকে স্মার্টফোনের যেকোনো অনুষঙ্গ, যেমন লেভেল ইউপ্রো ও গিয়ার ভিআরে থাকছে ৩ মাসের বিক্রয়োত্তর সেবা। তবে যে নির্মাতার স্মার্টফোনই কেনেন, তা অনুমোদিত দোকান থেকে কেনা ভালো।

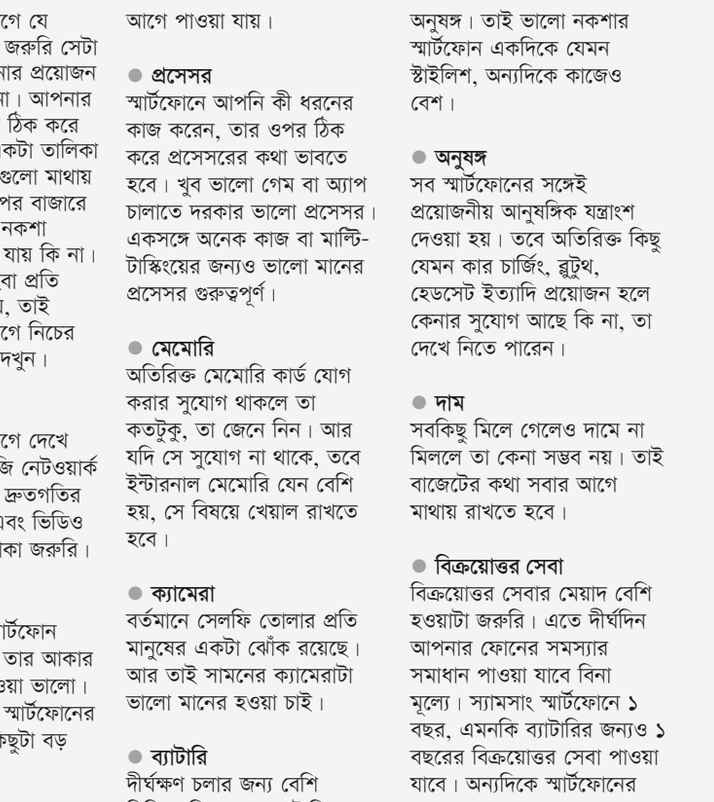

রাতে ঘুম ভেঙে মাথাব্যথা?

অধ্যাপক খান আবুল কালাম আজাদ
বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

আচমকা ঘুম ভেঙে মাথাব্যথা শুরু হয়? প্রায় রাতেই এমন ঘটে? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হতাশা ও বিষণ্নতাই এ সমস্যার কারণ। মানসিক চাপ ও হতাশা কাটিয়ে উঠতে পারলেই এ রকম মাথাব্যথা থেকে মুক্তি মিলবে।

মাইগ্রেন, মাংসপেশির টান বা চাপের কারণে সাধারণত দিনের বিভিন্ন সময়ে মাথাব্যথা হয়ে থাকে। সেই ব্যথা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেও অনেক সময় রোগীর ঘুম ভেঙে তীব্র মাথাব্যথা শুরু হতে পারে। দাঁত, চোখ, কান, টনসিল, সাইনাস কিংবা ঘাড়ের বিভিন্ন সমস্যার কারণেও মাথাব্যথা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে মাথাব্যথা ছাড়াও আনুষঙ্গিক নানান উপসর্গ দেখা দেয়।

সাধারণ মাথাব্যথায় ভয়ের কিছু নেই। তবে কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকুন—

* যাঁদের মাথাব্যথা শেষ রাত থেকে সকালের দিকে তীব্র হয় এবং সঙ্গে বমি থাকে, তাঁদের অবশ্যই অবিলম্বে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। মস্তিষ্কের ভেতরকার তরলের স্বাভাবিক চাপ নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে এমন লক্ষণ দেখা দেয়, তাই জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা প্রয়োজন। মস্তিষ্কে টিউমার বা জীবাণুর সংক্রমণ হলে এমনটা হয়ে থাকে। অনেক সময় চোখে দেখতেও অসুবিধা হতে পারে। জীবাণু সংক্রমণের কারণে এমন ব্যথা হলে জ্বরও হতে পারে।

● খুব অল্প সময়ে মাথাব্যথা তীব্র আকার ধারণ করলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

● এমনিতে মাথাব্যথা হলে প্যারাসিটামল সেবন করতে পারেন। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অন্য কোনো ব্যথানাশক সেবন করবেন না।

● মাইগ্রেনের ব্যথা যেসব কারণে বাড়তে পারে, সেগুলো এড়িয়ে চলুন।

● বিপজ্জনক কোনো লক্ষণ না থাকলে মাথাব্যথা নিয়ে ভয় পাবেন না। দুশ্চিন্তা, হতাশা ও মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। প্রফুল্লচিত্তে কাজ করুন। বিষণ্নতা এড়াতে জীবনের ভালো দিকগুলোর কথা ভাবুন, জীবনের অর্জনগুলোর জন্য নিজেকে বাহবা দিন। মন খারাপের ভাবনাগুলোকে বিদায় দিন। তাহলে মাথাব্যথা থেকে দূরে থাকবেন।

গুলশানের নৃশংস হামলায় হতাহতের ঘটনায় শোক জানিয়েছেন মুশফিক-তামিম-মাশরাফিদের মতো অন্য ক্রিকেট তারকারাও ● ছবি : ফেসবুক

মাশরাফি-তামিমরা শোকস্তব্ধ

ক্রীড়া প্রতিবেদক ●

বোর্দোর স্তাদ দো বোর্দোয় পরশু ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে বুফন-কিয়েলিনিরা স্মরণ করেছেন ঢাকার গুলশানে হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় পৈশাচিক ও নৃশংস সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ব্যক্তিদের। সন্ত্রাসী এই হামলায় নিহত ব্যক্তিদের জন্য শোকার্ত মাশরাফি বিন মুর্তজা-তামিম ইকবালরাও।

গত ১ জুলাই রাতে গুলশানের ওই সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় ভীষণ মর্মাহত তামিম ইকবাল। ঘটনার নিন্দা জানিয়ে নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে একের পর এক টুইট করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের এই বাঁহাতি ওপেনার। অসাম্প্রদায়িক দেশের অনন্য এক উদাহরণ বাংলাদেশ। যুগ যুগ ধরে ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে সহাবস্থান করে আসছে এ দেশের মানুষ। এখানকার মানুষ ভীষণ অতিথিপরায়ণ; বিদেশিরা তাদের কাছে দেবতুল্য।

শান্তিপ্রিয় দেশটিতেই কিনা এমন নৃশংসা হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন তিন বাংলাদেশিসহ কয়েকজন বিদেশি নাগরিকও? তামিম যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না। পরপর কয়েকটি টুইট বার্তায় এ কথাগুলোই তুলে ধরেছেন তামিম। একটি টুইট বার্তায় বাংলাদেশ দলের ওপেনার লিখেছেন, 'এটা আমাদের দেশের আসল ছবি না। আমাদের যেন আর কখনো এভাবে পরিচিত হতে না হয়। হে আল্লাহ, আমার দেশ-ঘরকে শান্তিতে রাখুন!' আরও একটি টুইট বার্তায় দেশের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যান লিখেছেন, 'গত রাতে (শুক্রবার) হলি আর্টিজানে যা হলো এটা বাংলাদেশের চেহারা নয়।' এ ছাড়া হ্যাশ ট্যাগে লিখেছেন, 'প্রে ফর ঢাকা' বা 'ঢাকার জন্য প্রার্থনা'।

তামিমের মতো তাঁর সতীর্থরাও নিহত ব্যক্তিদের প্রতি শোক জানিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। বাংলাদেশ টেস্ট অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম ফেসবুকে নিজের অফিশিয়াল পেজের প্রোফাইল ছবিটি কালো করে দিয়েছেন। সেখানে হ্যাশ ট্যাগে লেখা 'প্রে ফর ঢাকা'। তাঁর কভার ছবিতে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ে ব্যবহৃত বাংলাদেশের পতাকার ছবি।

ফেসবুকে প্রোফাইল ছবি পরিবর্তন করে একে একে শোক জানিয়েছেন মাশরাফি বিন মুর্তজা, মাহমুদউল্লাহ, নাসির হোসেন, মুস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, মুমিনুল হক, সাব্বির রহমানের মতো তারকারা। ছবির নিচের অংশে পতাকায় লেখা 'উই আর বাংলাদেশ'।

ইংল্যান্ডের আশায় বাংলাদেশ

ক্রীড়া প্রতিবেদক ●

ঢাকার গুলশানে হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় ঘৃণ্য সন্ত্রাসী হামলার পরই অক্টোবরের ইংল্যান্ডের বাংলাদেশ সফরকে ঘিরে উড়তে শুরু করেছে শঙ্কার মেঘ। মর্মান্তিক এই ঘটনায় বাংলাদেশ সফরকালীন নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান অবশ্য আশাবাদী, ইংলিশ দল সময়মতোই পা রাখবে বাংলাদেশে।

গুলশানে সন্ত্রাসী হামলার পর স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। ইসিবির এক মুখপাত্র এএফপিকে জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহ ও মাসগুলোয় নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। সফরের আগে ইংল্যান্ড দলের জন্য নিরাপত্তাব্যবস্থার খুঁটিনাটি জানতে পাঠাবে পরিদর্শক দলও। সবকিছু শেষে যদি কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সেটিও নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন ইসিবির মুখপাত্র, 'আগামী সপ্তাহ ও মাসগুলোয় আমরা বাংলাদেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করব। ইংল্যান্ড দলের জন্য নিরাপত্তাব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখতে সফর-পূর্ব পরিদর্শনটা হবে খুব নিবিড়। আমরা বৈদেশিক ও কমনওয়েলথ অফিসের (এফসিও) সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখব। আমাদের নিরাপত্তা পরিচালক রেগ ডিকাসন কিংবা এফসিও যদি বলে, পরিস্থিতি নিরাপদ ও যথাযথ নয়, আমরা সেই অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত নেব।'

স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় অনুষ্ঠিত আইসিসির সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক সভা শেষে ৩ জুলাই সকালে দেশে ফিরেছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল। ওই দিন বিকেলে গুলশানে নিজ বাসায় সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানালেন, ইসিবির প্রতিক্রিয়াটা বিসিবির চোখে স্বাভাবিক, 'ইংল্যান্ডের প্রতিক্রিয়া দেখেছি। আমরা যদি ওদের জায়গায় থাকতাম একই কাজ করতাম।'

শুধু বাংলাদেশ নয়, সন্ত্রাসী হামলায় কেঁপে উঠছে বিশ্বের নানা প্রান্ত। গত বছর নভেম্বরে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছিল প্যারিসে। কয়েক মাসের ব্যবধানে সেখানেই নির্বিঘ্নে হচ্ছে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবল। হাতে এখনো তিন মাস সময় থাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে এবং ইংল্যান্ডের সফরও হবে বলে বিশ্বাস নাজমুলের, 'প্যারিসে ওই আক্রমণের পরও কিন্তু খেলা বন্ধ হয়ে যায়নি। খেলা তার নিজস্ব গতিতেই চলবে। এ ছাড়া ইংল্যান্ড সিরিজের এখনো তিন মাস বাকি। এত দিন বাংলাদেশে এমন পরিস্থিতি থাকবে না।'

নিরাপত্তা নিয়ে সংশয়ের কারণে গত বছরের সেপ্টেম্বর দল ঘোষণা করেও শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশ সফর স্থগিত করেছিল অস্ট্রেলিয়া। এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আশঙ্কা থাকে। তবে বিসিবি সভাপতি বিষয়টি নিয়ে ইতিবাচকই আছেন, 'নিরাপদ জায়গা কোনটি, বলা মুশকিল। তিন মাস পরে ইংল্যান্ড নিরাপদ না-ও থাকতে পারে, কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। পরিস্থিতি যা-ই হোক, আমাদের নিরাপত্তাব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে।'

আলীর মতো ফিরবেন আমির!

কিংবদন্তি বক্সার মোহাম্মদ আলীর মতোই ফিরবেন পাকিস্তান পেসার মোহাম্মদ আমির! তুলনাটা একটু বিস্ময়কর হলেও এমনটাই বলছেন ফিক্সিংয়ের দায়ে নিষিদ্ধ হওয়া সালমান বাট।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে 'ড্রাফট ইভেশনে'র দায়ে ১৯৬৭ সালে কেড়ে নেওয়া হয় মোহাম্মদ আলীর শিরোপা। বক্সিং লাইসেন্স বাতিল করার পাশাপাশি তাঁকে জরিমানাসহ সাড়ে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বক্সিং রিংয়ে আলী ফেরেন ১৯৭০ সালে, পরাজিত করেন জেরি কুয়েরেকে। সাময়িক নিষিদ্ধ হলেও প্রয়াত বক্সার কিংবদন্তির জন্য সেটি নিশ্চয়ই কলঙ্কের ছিল না।

আমিরের বিষয়টি ভিন্ন। ২০১০ সালের লর্ডস টেস্টে স্পট ফিক্সিংয়ের দায়ে বাঁহাতি পেসারের গায়ে লেগেছিল কলঙ্কের কালি। এরপর তাঁর ক্রিকেট ক্যারিয়ার থেকে হারিয়ে গেছে পাঁচটি বছর। কলঙ্কিত অধ্যায় পেছনে ফেলে আমিরের টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হচ্ছে লর্ডসেই। ইংল্যান্ডের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ১৪ জুলাই। বাট মনে করেন আলীর মতো প্রত্যাবর্তন ঘটবে আমিরের, ক্রিকেটের বড় দৈর্ঘ্যে বীরদর্পে ফিরবেন তিনি, 'সীমিত ওভারের ক্রিকেটে (নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ফিরে) ভালো করেছে। সে আরও ভালো করতে পারে। দীর্ঘদিন বসে থাকায় যে কারওর ক্যারিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে একেকজনের ক্ষেত্রে সেটি একেকরকম। যদি কেউ সাফল্যের জন্য ক্ষুধার্ত ও লক্ষ্যে অবিচল থাকে, যেমনটা আলী করেছিলেন নিষিদ্ধ থাকা সময়ে, তাহলে যে কেউ সফল হতে পারে।'

আমিরকে নিয়ে আশাবাদী বাটও গত পাঁচ বছর নিষিদ্ধ ছিলেন স্পট ফিক্সিংয়ের দায়ে। তরুণ বাঁহাতি পেসারের গায়ে কলঙ্কের কালি লাগার পেছনে তাঁর দায়ও কম নয়। লর্ডস টেস্টে পাকিস্তান দলের অধিনায়ক ছিলেন বাটই। নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে আসা ৩১ বছর বয়সী বাটও প্রহর গুনছেন ক্রিকেটে ফেরার, 'কঠোর পরিশ্রম করছি। যেকোনো ধরনের ক্রিকেটে ভালো করার চেষ্টা করছি। দলে ফিরতে এই একটা রাস্তাই খোলা।'

আমিরের মতো বাটের ফেরাটা অবশ্য সহজ হবে না। প্রধান নির্বাচক ইনজামাম-উল-হক গত মাসেই বলে দিয়েছেন, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ভালো করতে পারলে তবেই বাট ও আরেক নিষিদ্ধ বোলার আসিফকে বিবেচনা করা হতে পারে। এএফপি।

শোক ও নীরবতা

অন্য কোনো উপলক্ষে হলে হয়তো সানন্দে বলা যেত, ইউরোর মঞ্চে শোনা গেল বাংলাদেশের নাম! কিন্তু গত ২ জুলাই বুফন-বোনুচ্চি-ওজিল-মুলারদের কাছে যে কারণে লাল-সবুজ পতাকার এই দেশটির নাম পৌঁছে গেল, সেটি বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্ধকারতম অধ্যায়গুলোর একটি। গত শুক্রবার গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারিতে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন নয়জন ইতালিয়ান নাগরিকও। তাঁদেরই স্মরণে ইউরোতে ইতালি-জার্মানি কোয়ার্টার ফাইনালে ইতালি দল খেলতে নামল বাহুতে কালো বন্ধনী পরে, আর ম্যাচ শুরুর আগে করা হলো এক মিনিট নীরবতা পালন। ২ জুলাই স্তাদ দো বোর্দোতে ● রয়টার্স

'অভিমান' ভুলে তাহলে ফিরছেন মেসি?

সপ্তাহ খানেক আগে তাঁর অবসর ঘোষণার পর থেকেই প্রশ্নটা ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাতাসে, 'মেসি কি আসলেই আর্জেন্টিনা জাতীয় দলকে চিরতরে বিদায় বলে দিয়েছেন? নাকি এ শুধুই সাময়িক অভিমান, কিছুদিন পরই আবার আকাশি-সাদায় উজ্জ্বল হয়ে ফিরবেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক?'

আর্জেন্টিনার শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা *লা ন্যাসিওন*-এর প্রতিবেদন, দ্বিতীয়টিই সত্যি হতে চলেছে। এক প্রতিবেদনে পত্রিকাটি জানিয়েছে, লিওনেল মেসির অবসর ঘোষণাটা আসলে সাময়িক বিরতির মতোই হতে যাচ্ছে। বিরতি শেষে আবারও জাতীয় দলে ফিরবেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক।

২০০৬, ২০১০ ও ২০১৪—তিন বিশ্বকাপেই মেসির সঙ্গে খেলেছেন, এমন ঘনিষ্ঠ এক সতীর্থ *লা ন্যাসিওন*কে বলেছেন, 'ও ফিরবে। ২০১৮ বিশ্বকাপও ওর ভাবনায় আছে।'

শতবার্ষিকী কোপা আমেরিকার ফাইনালে চিলির কাছে টাইব্রেকারে হেরেছে আর্জেন্টিনা। টানা তিন বছরে তিনটি বড় টুর্নামেন্টের ফাইনালে গিয়েও হারের যন্ত্রণা থেকেই হয়তো ম্যাচের পরই আর্জেন্টিনার হয়ে আর না খেলার কথা জানিয়ে দেন মেসি। এরপর থেকে মেসিকে সিদ্ধান্ত পাল্টানোর জন্য যেন রীতিমতো 'আন্দোলনে' রূপ নিয়েছে। ডিয়েগো ম্যারাডোনা, পেলের মতো কিংবদন্তিরা তাঁকে সিদ্ধান্ত বদলানোর অনুরোধ করেছেন। আর্জেন্টিনার মানুষও এরই মধ্যে বুয়েনস এইরেসের রাস্তায় নেমে এসেছেন মেসিকে আবারও আর্জেন্টিনার জার্সিতে ফেরানোর দাবি নিয়ে। এমন অবিশ্বাস্য সমর্থনে কি একটু মন গলেছে মেসির? হয়তোবা।

তবে ফিরলেও কখন ফিরবেন মেসি? উত্তরটা জানতে অবশ্য অপেক্ষা করতেই হচ্ছে। আগামী সেপ্টেম্বর থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ। সেপ্টেম্বরের ২ ও ৬ তারিখে উরুগুয়ে ও ভেনেজুয়েলা, এরপর আগামী অক্টোবরেও দুটি ম্যাচ—পেরু ও প্যারাগুয়ে। আগামী নভেম্বরে আছে বড় দুটি ম্যাচ, ৭ নভেম্বর ব্রাজিল, আট দিন পর কলম্বিয়া। মেসি ঠিক এর কোন ম্যাচটি দিয়ে আবারও আলবিসেলেস্তে জার্সিতে ফিরবেন, সেটি এখনই নিখুঁতভাবে বলা যাচ্ছে না।

লা ন্যাসিওন-এর প্রতিবেদনই (গুগল ট্রান্সলেটর যদি সঠিক অনুবাদ করে থাকে) ভরসা, 'এই মুহূর্তে পরিবারের সঙ্গে বাহামাতে ছুটি কাটাচ্ছেন মেসি। এখনই তাঁর ফেরার তারিখ নিয়ে নিখুঁতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হচ্ছে। তবে সঙ্গে এটাও জেনে রাখুন, নাটকের শেষটা ঠিক হয়েই আছে–মেসি ফিরে আসবেন।'

জার্মানির শাপমোচন

UEFA EURO2016 FRANCE

জার্মান দৈনিক *বিল্ড*-এর শিরোনাম, 'অবশেষে কাটল ইতালি-শাপ!'

একভাবে দেখলে কথাটা সত্যি। অন্যভাবে দেখলে, সত্যি নয়। প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে এর আগে কোনো দিন ইতালির বিপক্ষে জিততে পারেনি জার্মানি। পরশু বোর্দোতে ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালে জিতল তো। ইতালি-শাপ কেটেছে, এই দাবি জার্মানরা করতেই পারে।

তবে জয়টা টাইব্রেকারে, ৬-৫ ব্যবধানে। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষ হয়েছে ১-১ গোলের সমতায়। ফিফার নিয়ম অনুসারে এ ম্যাচের ফল ড্র-ই লেখা থাকবে পরিসংখ্যানে। প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে জার্মানির বিপক্ষে অজেয় থাকার দাবি তো ইতালি করতেই পারে!

জার্মানদের অবশ্য এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই এখন। ইতালি অজেয় থাকুক বা না-থাকুক, তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। মূল কাজটা ছিল ইউরোর সেমিফাইনালে ওঠা, সেটি ঠিকই করেছে জোয়াকিম লোর দল। জার্মান ড্রেসিংরুম তাই উচ্ছ্বাসে ভাসছে।

পুরো ম্যাচে নাটকীয়তা যেটুকু হয়েছে, সেটা টাইব্রেকারেই। প্রথম পাঁচটি করে নেওয়া শটে দুই দলেরই তিনজন করে ব্যর্থ হন গোল করতে। ইতালির হয়ে গোল করেন লরেন্সো ইনসিনিয়ে ও আন্দ্রেয়া বারজাল্লি। ব্যর্থ হন সিমোনে জাজা, গ্রাৎসিয়ানো পেল্লে ও লিওনার্দো বোনুচ্চি।

জার্মানির হয়ে টাইব্রেকারে গোল করেন টনি ক্রুস ও ইউলিয়ান ড্রেখসলার। ব্যর্থ হন টমাস মুলার, মেসুত ওজিল ও বাস্তিয়ান শোয়েনস্টাইগার। শোয়েনস্টাইগারের শটটা ইতালির জালে গেলেই সেমিফাইনালে নিশ্চিত হতো জার্মানির।

এরপর সাডেন ডেথেও টানা তিনটি করে শটে গোল করে ইতালি ও জার্মানি। কিন্তু মাত্তেও দারমিয়ানের চতুর্থ শটটা ফিরিয়ে দেন জার্মান গোলরক্ষক ম্যানুয়েল নয়্যার। জার্মানির হয়ে চতুর্থ শটে ইয়োনাস হেক্টর গোল করতেই উল্লাসে মাতে জার্মানরা।

শেষ পর্যন্ত পুরোটাই ভাগ্যের খেলা হয়ে উঠেছিল। আর সেই খেলায় জেতায় নিজেদের ভাগ্যবান ভাবছেন জার্মান কোচ জোয়াকিম লো, 'অবশ্যই শেষ পর্যন্ত ভাগ্য আমাদের পক্ষে ছিল। তবে ম্যাচেও আমরা যোগ্যতর দল ছিলাম।' কোচের কথারই প্রতিধ্বনি তুলেছেন গোলরক্ষক নয়্যার, 'আমি তো মনে করি সেরা দলটাই সেমিফাইনালে উঠেছে।'

২০০৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালেও আর্জেন্টিনার বিপক্ষে এমন পরিস্থিতিতে পড়েছিল জার্মানি। বার্লিনে সেদিন জার্মান ডাগ-আউটে ছিলেন কোচ ইয়ুর্গেন ক্লিন্সমান, তাঁর সহকারী হিসেবে এই লো। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় ১-১ সমতায় শেষ হওয়ার পর ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানেই আর্জেন্টিনাকে ৪-২ ব্যবধানে হারিয়ে দেয় জার্মানি। ওই অভিজ্ঞতা এই ম্যাচে কাজে লেগেছে বলেই জানালেন লো, 'এটা ছিল নাটকীয় একটা ম্যাচ। একেবারে শুরু থেকে শেষ শটটা পর্যন্ত। ২০০৬ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচেও আমার এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। ওটা কাজে দিয়েছে।'

জার্মানির বিপক্ষে অজেয় থাকার রেকর্ড থাকলেও ইতালি আক্ষেপ করতেই পারে। টুর্নামেন্টজুড়ে পরিকল্পিত খেলেও শেষ পর্যন্ত কিনা বাদ পড়তে হলো টাইব্রেকারের ভাগ্যপরীক্ষায়! এএফপি, রয়টার্স।

মুস্তাফিজও সাসেক্সে যেতে উন্মুখ

রানা আব্বাস ●

আইপিএল থেকে আসার পরই তাঁর সঙ্গে লুকোচুরিই চলছিল সাংবাদিকদের! কিছুতেই কথা বলতে রাজি নন মুস্তাফিজুর রহমান। দুই দিন আগে অবশ্য কথা দিয়েছিলেন ঈদ করতে বাড়ি যাওয়ার আগে কথা বলবেন। কথা রেখেছেন মুস্তাফিজ। অবশেষে অচলায়তন ভেঙেছেন, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন 'দ্য ফিজ'!

১ জুলাই বিসিবি একাডেমি মাঠে মুস্তাফিজের আলাপচারিতায় স্বাভাবিকভাবেই উঠে এল সাসেক্স-প্রসঙ্গ। ইংল্যান্ডে কবে উড়াল দিচ্ছেন, এখনো নিশ্চিত জানা যায়নি। তবে ভিসার আবেদন করেছেন। সব ঠিক থাকলে ১৩ জুলাই সাসেক্সের হয়ে খেলতে উড়াল দিতে পারেন বাঁহাতি পেসার—বিসিবি মিডিয়া কমিটির সভাপতি জালাল ইউনুস এমনটিই বলেছেন সংবাদমাধ্যমকে। সেটি হলে ন্যাটওয়েস্ট টি-টোয়েন্টি ব্লাস্ট ও রয়্যাল লন্ডন ওয়ানডে কাপের চারটি ম্যাচে খেলার সুযোগ হয়তো পাবেন 'কাটার মাস্টার'। এর আগে সাসেক্স ইঙ্গিত দিয়েছিল, তাদের হয়ে মুস্তাফিজের অভিষেক হতে পারে ১৫ জুলাই।

কাউন্টি দলটিতে খেলা নিয়ে মুস্তাফিজ কী ভাবছেন? ইংলিশ কন্ডিশনে খেলতে যে তিনি উন্মুখ, সেটি বেশ বোঝা গেল তাঁর কথায়, 'ওখানে গেলে ভালোই হবে। ক্রিকেটের প্রথম (জনক) তো ইংল্যান্ড। সুযোগ পেলে চেষ্টা করব সেরাটা দেওয়ার।'

ইংল্যান্ডে অবশ্য আগেও গেছেন মুস্তাফিজ, সেটি ২০১৩ সালের আগস্টে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে ত্রিদেশীয় যুব সিরিজ খেলতে। চোটে পড়ায় একটির বেশি ম্যাচ খেলা হয়নি সেবার। লাফবরোতে পাকিস্তানের সঙ্গে বৃষ্টিবিঘ্নিত পরিত্যক্ত ম্যাচটিতে বোলিং করতে পেরেছিলেন ৪ ওভার, ১৫ রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য।

সময়ের সঙ্গে বদলেছে ছবি। সেদিনের মুস্তাফিজ আর আজকের মুস্তাফিজে যে বিস্তর পার্থক্য। এখন তাঁর বোলিং মানেই যেন দারুণ কিছু। এবারও বাঁহাতি পেসার তৈরি হচ্ছেন নিজের সেরাটা নিয়ে ইংলিশ দর্শকদের সামনে হাজির হতে। মুস্তাফিজের 'সেরাটা' মানে প্রতিপক্ষ বেসামাল! কিন্তু ব্যাটসম্যানদের নাকাল করতে তূণে থাকা অস্ত্রগুলো কি শাণ দেওয়া হয়েছে ঠিকভাবে?

আইপিএল থেকে ফিরেছিলেন পায়ের চোট নিয়ে। ৯ জুন থেকে শুরু হয়েছে তাঁর পুনর্বাসন-প্রক্রিয়া। শেষ হওয়ার কথা ৯ জুলাই। এরই মধ্যে নেটে পাঁচ সেশন বোলিং করেছেন। শতভাগ ছন্দ ফিরে পেয়েছেন কি না পরিষ্কার না বললেও এ নিয়ে তাঁকে বেশ ইতিবাচকই দেখাল, 'আপনাদের দোয়ায় সবকিছু ভালো যাচ্ছে। শুরুতেই (আইপিএল থেকে আসার পর) বোলিং করতে পারিনি। এখন করছি। সবকিছু ভালো আছে।'

অভিষেকের পরই বাংলাদেশের হয়ে মুস্তাফিজ উপহার দিয়ে চলেছেন রঙিন সব মুহূর্ত। প্রথমবারের মতো আইপিএল খেলতে গিয়েও বাজিমাত! এবার ইংল্যান্ড জয়ের পালা।

শাকিব খান

জিৎ

শাকিব খানকে জিতের শুভেচ্ছা

শফিক আল মামুন

উড়োজাহাজ থেকে নেমেই গাড়িতে। চলতে চলতে এয়ারপোর্ট রোডের মুখে যানজটে আটক। গাড়ির স্বচ্ছ কাচের দিকে আঙুল তুলে পথচারীদের কয়েকজনকে বলতে শোনা গেল...ওই যে জিৎ, জিৎ ...। বোঝা যায়, কলকাতার বাংলা ছবির নায়ক জিৎ-এর ভক্ত এই বাংলাতেও কম নেই। কিছুক্ষণ আগে সোনারগাঁও হোটেলের যে কক্ষটিতে তিনি উঠেছেন, সেখানে বসেও বলছিলেন, 'এখানকার দর্শক, ভক্তদের জন্যই ছুটে আসি।'

২৯ জুন সকালেই কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছান এই টালিউড তারকা। এসকে মুভিজ ও জাজ মাল্টিমিডিয়ার যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত 'বাদশা' ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। ঈদুল ফিতরে একই সঙ্গে দুই বাংলায় মুক্তি পাবে ছবিটি। সেই প্রচারণায় অংশ নিতেই সকালে বাংলাদেশে এসেছেন জিৎ।

কোথায় কোথায় যাচ্ছেন জানতে চাইলে জিৎ বলেন, শুরুতে ঢাকা ক্লাবে যাব। সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলব। তাঁদের সঙ্গে ইফতারি খাব। পরে বেশ কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে অংশ নেব। ছবি প্রসঙ্গে বললেন, 'মুক্তির পর দর্শকেরা কীভাবে নিচ্ছেন সেটাই দেখার বিষয়। 'বাদশা' ছবিতে আমার চরিত্রের মধ্যে অ্যাচিভ করার একটা ব্যাপার আছে। পুরো ছবির মধ্যেই আছে অ্যাডভেঞ্চার।'

'বাদশা' ছবিটি শেষ করতে সময় লেগেছে টানা ৫৫ দিন। জানালেন, অনেক মজা করে কাজটি করেছেন সবাই। শুটিংয়ের সময় ঘটেছে নানা মজার ঘটনা। একটি ঘটনার কথা বলতে গিয়ে জিৎ বলেন, 'সোনারগাঁওয়ের ট্রেন স্টেশনে গিয়ে দেখা গেল ট্রেনের ছাঁদে বসেও অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করেন। পরিচালক আমাকে বললেন ট্রেনের ওপর দিয়ে দৌড়াতে। আমি ট্রেনের ওপর গিয়ে দাঁড়ালাম। শুরুতে কিছুই মনে হয়নি। ট্রেনটি যখনই চলতে শুরু করল, মনে হলো এই বুঝি পড়ে গেলাম!'

বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জিৎ আগেই জেনেছিলেন যে, বাংলাদেশে নাকি তাঁর প্রচুর ভক্ত। তাঁর অভিনীত ছবি নিয়মিত দেখেন সেই দর্শকেরা। তাঁদের কথা ভেবেই যৌথ প্রযোজনার এই ছবিতে কাজের সিদ্ধান্ত নেন এই অভিনয়শিল্পী। সঙ্গে যুক্ত হবে নতুন এক অভিজ্ঞতা।

এই ঈদেই একই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে মুক্তি পাচ্ছে 'শিকারি' ছবিটি। শাকিব খানের সঙ্গে লড়াইটা কেমন হবে? প্রশ্নটি শুনে হাসলেন জিৎ। বললেন, 'এখানে লড়াই বলে কিছু নেই। শুধু একটা কথাই বলি, শাকিবের জন্য শুভেচ্ছা রইল।'

কথার মাঝেই ঢাকা ক্লাব থেকে বারবার ফোন আসতে লাগল। পাশাপাশি কলকাতা থেকে তাঁর সঙ্গে আসা সহযোগীদের তাড়া। ওঠার সময় হলো। 'বাদশা'-এর নায়িকা এই বাংলার মেয়ে নুসরাত ফারিয়াকে নিয়ে কিছু না বলেই কি উঠে যাবেন নায়ক জিৎ? উঠতে উঠতেই বললেন, 'ফারিয়া তো দারুণ অভিনয় করেছেন। তিনি নাচটাও ভালো জানেন। আত্মনির্ভর হয়ে তিনি আমার সঙ্গে কাজ করেছেন। ওঁর আরও ভালো কাজ করার সুযোগ আছে।'

ঈদে দর্শকদের সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে তারকারাও

বিনোদন প্রতিবেদক

আসছে ঈদে দেশের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে চারটি ছবি মুক্তি পেয়েছে। ছবিগুলো হলো *মেন্টাল*, *সম্রাট* এবং দুই বাংলার যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত দুটি ছবি *শিকারি* ও *বাদশা দ্য ডন*। ছবি মুক্তি উপলক্ষে বুকিং অফিসে যেমন ব্যস্ততা বেড়েছে, তেমনি ছবিগুলোর নায়ক-নায়িকাদেরও তাঁদের অভিনীত ছবিগুলো প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে দেখার প্রস্তুতিও কম নয়। তাঁদের ঈদ আনন্দের একটা বড় অংশই থাকছে মুক্তি পাওয়া এই সব ছবি ঘিরে।

পবিত্র রমজানের শেষ দিকে এসব তারকাদের কেউ কেউ *প্রথম আলোকে* বলেন, ঈদের দিন দর্শকের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে তাঁরা নিজের অভিনীত ছবি দেখবেন, পাশাপাশি দর্শকের প্রতিক্রিয়া জানারও ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন কেউ কেউ।

এবারের ঈদের সবচেয়ে বেশি ছবির নায়ক শাকিব খান। ঈদের চারটি ছবির মধ্যে তিনটিই তাঁর অভিনীত। যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত তাঁর প্রথম অভিনীত *শিকারি* ছবিটিও মুক্তির তালিকায় আছে। বাকি দুটি ছবি হলো *মেন্টাল* ও *সম্রাট*। *শিকারি* ছবিতে কলকাতার মেয়ে শ্রাবন্তীর সঙ্গেও প্রথম অভিনয় তাঁর। সব মিলে শাকিবের কাছে এবারের ঈদটাও একটু অন্য রকম। ২ জুলাই শাকিব খান বলেন, 'এবারের ঈদের ছবিগুলো নিয়ে আমি খুবই আগ্রহী।' কোন কোন প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে ছবি দেখতে চান, জানতে চাইলে শাকিব বলেন, 'ঈদের দিন সকালেই বেরিয়ে পড়ব। ঈদে সব সময়ই আমি হঠাৎ করে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে হাজির হই। নির্দিষ্ট কোনো সিনেমা হল নয়, দিন ভাগ করে ঢাকায় আমার অভিনীত সব কটা ছবির প্রেক্ষাগৃহেই যাওয়ার ইচ্ছা আছে।'

নুসরাত ইমরোজ তিশা অভিনীত বাণিজ্যিক ঘরানার ছবি *মেন্টাল*। ঈদ উৎসবে ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কারণে একটু বেশিই আনন্দিত তিনি। ছবিটির টিমের সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে ছবিটি দেখার ইচ্ছা তিশার। কোন প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে *মেন্টাল* দেখতে চান, এ প্রসঙ্গে তিশা বলেন, 'শুনেছি ঢাকার মধ্যে জোনাকি, এশিয়াসহ কয়েকটি হলে মুক্তি পাচ্ছে। ঢাকার বাইরের হলে বেশি। জোনাকি হলে বসে ছবিটি দেখার ইচ্ছা আছে।'

এ নিয়ে তিনটি ছবিতে অভিনয় করলেও *বাদশা দ্য ডন* ছবিটি নিয়ে বেশি রোমাঞ্চিত নুসরাত ফারিয়া। ছবিটিতে তাঁর নায়ক কলকাতার জনপ্রিয় তারকা জিৎ। ছবিটি এই ঈদে দুই বাংলায় এক সঙ্গেই মুক্তি পাচ্ছে। মুক্তির আগে আগে ছবিটির প্রচারের অংশ হিসেবে বর্তমানে ভারতে আছেন ফারিয়া। মুম্বাই গিয়ে গত পরশু রাতে কালারস টিভিতে বিগবস অনুষ্ঠানেও ছবিটির প্রচারে অংশ নেন তিনি।

ফারিয়া জানান, ঈদের দিন সকালে ফিরছেন ঢাকায়। দেশে ফিরে ঢাকা ও এর আশপাশের হলগুলোতে ঘুরবেন। দর্শকের প্রতিক্রিয়া জানবেন। তিনি বলেন, 'পুরো টিমের সঙ্গে ব্লকবাস্টারে ছবিটি দেখব। বলাকাতেও দেখার কথা আছে। এরপর ঢাকার আশপাশে যেসব প্রেক্ষাগৃহে *বাদশা দ্য ডন* মুক্তি পাচ্ছে, সেই সব জায়গাতে যাওয়ার ইচ্ছা।'

নুসরাত ইমরোজ তিশা

নুসরাত ফারিয়া

মোশাররফ করিম ও জুঁই করিম ● ছবি : সুমন ইউসুফ

তরুণ পরিচালকের সিনেমা নির্মাণের যুদ্ধ 'গ্রাস'

বিনোদন প্রতিবেদক

নবীন নির্মাতা মারিয়া তুষারের প্রথম ছবি '*গ্রাস*'-এর শুটিং শেষ। চলছে কিছু সম্পাদনার কাজ। এরপরই ছবিটি নাম লেখাবে মুক্তির মিছিলে। পরিচালক জানালেন, আগামী সেপ্টেম্বরে ছবিটি মুক্তি দেবেন। বললেন, 'এরই মধ্যে শুটিংয়ের যাবতীয় কাজ শেষ করেছি। গান রেকর্ডিং ও শুটিংও শেষ। এখন সম্পাদনা করছি। এটি শেষ হলেই সেন্সরে জমা দেব। তারপরই মুক্তির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব। ইচ্ছে আছে ঈদুল আজহার পরপরই মুক্তি দেওয়ার। বাকিটা পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে।'

'*গ্রাস*' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন তমা মির্জা, আরবি প্রিতম, রানী সরকার, জ্যোতিকা জ্যোতি, রিপন নাথ, কচি খন্দকার প্রমুখ।

ছবিটি প্রসঙ্গে পরিচালক বললেন, 'একজন তরুণ পরিচালকের সিনেমা নির্মাণের যে যুদ্ধ, সেটাই দেখানো হয়েছে '*গ্রাস*'-এ, যাতে দর্শকেরা আমাদের কষ্টটা বুঝতে পারেন। গেল বছর থেকে শুরু হয়েছে ছবিটির শুটিং। শেষ করেছি এ বছরের শুরুতে। নতুন পরিচালক হিসেবে ঠিকঠাকই কাজ শেষ করতে পেরেছি। এটাই আমার জন্য আনন্দের।'

'*গ্রাস*' চলচ্চিত্রের একটি গানের শুটিংয়ে তমা মির্জা ও আরবি প্রিতম

'ভাই-বোন' চরিত্রে স্বামী-স্ত্রী

বিনোদন প্রতিবেদক

বাস্তবে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু টেলিছবিতে দেখা দেখা যাবে ভাই-বোন হিসেবে। বলা হচ্ছে, জনপ্রিয় অভিনেতা মোশাররফ করিম ও তাঁর স্ত্রী রোবেনা রেজার কথা। আজ প্রচারিত হবে এই দম্পতি অভিনীত টেলিছবি 'কালপুরুষ কানাগলি'।

টেলিছবিটি নির্মাণ করেছেন নূর ইমরান মিঠু। গেল মার্চে হাজারীবাগ ও জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় নাটকের শুটিং হয়েছে। টেলিছবিতে রোবেনা রেজার স্বামী হিসেবে দেখা যাবে অভিনয়শিল্পী শাহাদাতকে।

বাস্তবের স্বামীর বোন হিসেবে অভিনয় প্রসঙ্গে রোবেনা বললেন, 'একটু অন্যরকম লেগেছে। কিন্তু টেলিছবিটির গল্প এত ভালো, কিছুক্ষণের মধ্যেই চরিত্রে ডুব দিতে হয়েছে। আর মোশাররফের দুর্দান্ত অভিনয়ে কারণে আশপাশের চরিত্রগুলোও অন্য মেজাজ পেয়েছে।'

টেলিছবির গল্প প্রসঙ্গে নির্মাতা বললেন, '২০ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া শাহানশাহ নামে একটি চরিত্রে ফিরে এসেছে বাড়িতে। বদলে যাওয়া শহর, শহরের জীবন, মানুষের বিশ্বাস—এমনকি মানবিক সম্পর্কগুলো একে একে সামনে দাঁড়ায় তাঁর। জীবন ও বোধের নানা ধরনের সম্পর্ক নিয়ে নির্মিত হয়েছে টেলিছবিটি। এতে শাহানশাহ চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম।'

আজ বিকেল তিনটায় চ্যানেল আইতে প্রচার হবে টেলিছবিটি।

সিনেমার গানে কত্থক নাচ

রাসেল মাহমুদ

সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন নৃত্যশিল্পী শিবলী মহম্মদ। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'পেইনকিলার খেয়েছি। এই অবস্থাতেই ঈদ আনন্দমেলায় নাচের শুটিং করলাম। দুপুরে কিন্তু না খেয়ে যেয়ো না।'

অল্প আলো জ্বলা পরিপাটি গোছানো ঘরটায় ঢুকে বোঝা গেল, বাইরে পুরোনো হলেও বাড়ির ভেতরটা একদম আধুনিক। পায়ের চিকিৎসার জন্য বাইরে যাবেন শিবলী মহম্মদ। ঠিক আগের দিন আড্ডা দিতে হাজির হই তাঁর বাসায়। সৈনিক ও নৃত্যশিল্পীর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ তাঁর পা। সেই পা নিয়েই বিপাকে তিনি। জানতে চাইলেন, ২৭ এপ্রিল নৃত্যাঞ্জল উৎসবের কত্থকসন্ধ্যায় ছিলাম কি না। 'না, দ্বিতীয় দিন নৃত্যনাট্যে ছিলাম' বলতেই বললেন, 'দারুণ মিস করেছ। সেদিনের পরিবেশনা দেখে নাট্যশালাভর্তি দর্শক আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পড়েছিল।'

'দেখা হয়নি যখন শোনো তাহলে। আমার গুরুজি পণ্ডিত **বির্জু** মহারাজ যেদিন ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পেলেন, সেদিনই মাথায় এল চিন্তাটা। *বাজিরাও মাস্তানি* ছবির "মোহে রাঙ্গদো লাল" গানের জন্য তিনি ওই পুরস্কার পেলেন। এরই দুই বছর আগে ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেলেন *দেবদাস* ছবির "কাহি ছিড় ছিড় মুহি" গানে নৃত্যপরিচালনার জন্য। ছোটবেলা থেকেই সিনেমায় নাচ দেখে আসছি। অনেকেই জানি না ওগুলো কোন ঘরানার। ছবি ব্যবসাসফল হচ্ছে, লোকে দেখছে কিন্তু জানছেই না যে এটা বিশুদ্ধ কত্থক নাচ। আমার দায়িত্ব এটা এখনকার প্রজন্মকে জানানো। আমাদের উৎসবে তাই বিভিন্ন দশকের সিনেমায় দেখানো কত্থক নাচগুলো নিয়ে কত্থকসন্ধ্যা করা। তরুণ শিল্পীরা সেসবের দুর্দান্ত পরিবেশনা করল, ভাবা যায়!'

শিবলী মহম্মদ

স্মার্টফোনে নাচের ছবিগুলো দেখাতে দেখাতে বললেন, 'অনেক ছবি। ভাইবারে দিয়ে দিই, দেখে নিয়ো।' ছবিগুলো মেইলে চাইতেই বললেন, 'অত কিছু বুঝি না। ইউটিউব আর ভাইবার আমাকে শেষ করে দিচ্ছে। আর কিছু শিখতে চাই না। এই বছরটাই শেষ। তারপরে এসব ছেড়ে দিয়ে আবারও বই পড়ায় মন দেব। জানো, বইয়ের পোকা ছিলাম একসময়?'

মেঝেতে পাতা ম্যাট্রেসে হেলান দিয়ে বসতে বসতে জানতে চাই, নাচগুলো আবার কবে যেন দেখা যাবে?

তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলেন, 'ঈদের দ্বিতীয় দিন বিকেল চারটায় বাংলাভিশনে। এখানেই প্রথম নীপা আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছে, ফাঁকে ফাঁকে নাচ। পুরোনো সিনেমার সাতটা কত্থক নাচ দেখতে পাবে। এগুলোর মধ্যে *বাজিরাও মাস্তানি* ও *দেবদাস* ছবির নাচও থাকবে। গুরুজি শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন। তুমি যেখানে বসে আছ, গুরুজি এখানে অনেকবার বসেছেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা সিনেমায় কত্থক ব্যবহার করতেন। দীপিকা তো নাচ জানে না, কিন্তু শিখে নিয়েছে। আর মাধুরি আমার গুরুরই শিষ্য। কত ভালো নাচেন তিনি। গুরুজির প্রিয় শিষ্য শাশ্বতী সেন নেচেছিলেন সত্যজিৎ রায়ের *সাতরঞ্জ কা খিলাড়ি* ছবির "কানহা ম্যা তোসে হারে" গানে। গানটি গেয়েছিলেন স্বয়ং গুরুজি। ওই নাচ করাতে গিয়েই গুরুজির সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের পরিচয়।'

'ঠিক আছে, এবার আর অনুষ্ঠান মিস করব না।' জানতে চাই, 'আমাদের দেশের সিনেমাগুলোয় নৃত্যপরিচালনা করেন না কেন?'

একটু বিরক্ত হয়েই তিনি বলেন, 'সেটা পরিচালকেরা জানে। বাংলা ছবিগুলোতে কিন্তু চাইলেই ভালো নাচ রাখা যায়। তা না করে শুধু হাত-পা ছোড়া দেখানো হচ্ছে।'

নাটকের জন্য গাইলেন মম

বিনোদন প্রতিবেদক

'মা-বাবা ছোটবেলা থেকে আমাকে নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, ছবি আঁকা—সবই শিখিয়েছেন। অভিনয়টাই এখন নিয়মিত করা হয়। বিশেষ দিবসের নানা অনুষ্ঠানে অবশ্য নাচও করি। আবৃত্তি, ছবি আঁকা ও গান একেবারেই করা হয় না। এবারই প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ গান করলাম। সেটাও আবার অনেক শ্রোতাপ্রিয় একটি গান।' কথাগুলো বললেন অভিনয়শিল্পী জাকিয়া বারী মম।

সৈয়দ আবদুল হাদী ও সামিনা চৌধুরীর গাওয়া *জন্ম থেকে জ্বলছি* ছবির 'একবার যদি কেউ ভালোবাসত' গানটি নতুন করে গেয়েছেন মম ও তাহসান। ঈদুল ফিতরের জন্য নির্মিত শিহাব শাহীনের *রূপকথা এখন আর হয় না* নাটকে শোনা যাবে গানটি। গতকাল বুধবার রাজধানীর মগবাজারের একটি স্টুডিওতে আমজাদ হোসেনের লেখা এ গানে মমর কণ্ঠ ধারণ করা হয়। সকালে *প্রথম আলোর* সঙ্গে আলাপে মম বলেন, 'এ গানটি বাংলা সিনেমার কয়েকটি কালজয়ী গানের একটি। রোমান্টিক এই গান কমবেশি সবারই জানা। তাই এ গানটি গাওয়া আমার কাছে ছিল অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের। পরিচালকই চাইছিলেন, আমি যেন গানটি গাই। তাঁর চাওয়াটাকে সম্মান জানিয়ে রাজি হয়েছি। চেষ্টা করেছি ঠিকঠাক করে গাইবার। বাকিটা শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া থেকে জানব।'

বেশ কিছুদিন আগে *ভালোবাসার চতুষ্কোণ* নাটকের একটি গানে অপূর্বর সঙ্গে দুটি লাইন গেয়েছিলেন বলে জানান মম।

প্রথম আলো

সাক্ষাৎ কাতারে নবনিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূত অ্যাড্রিয়ান নরফোক সম্প্রতি বাংলাদেশ দূতাবাসে রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে দুই রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ ও কানাডার দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ● প্রথম আলো

গরমে কাজের সময়সূচির সুফল পাচ্ছেন শ্রমিকেরা

বাহরাইনে অসুস্থ হয়ে পড়ার হার কমেছে

প্রথম আলো ডেস্ক ●

প্রচণ্ড গরমের কারণে বাহরাইনে শ্রমিকদের অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। দেশটির প্রধান হাসপাতাল সালমানিয়া মেডিকেল কমপ্লেক্সে (এসএমসি) গত মাসে এ রকম অসুস্থতায় মাত্র আটজন ভর্তি হন এবং তাঁদের অবস্থা খুব বেশি গুরুতর ছিল না। অথচ গত বছর এ সময় গরমে অসুস্থ হয়ে প্রায় ৩০ জন এসএমসিতে ভর্তি হয়েছিলেন। এর কারণ হিসেবে গরম থেকে নিরাপদ থাকার ব্যাপারে শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা

এরপর পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

প্রতারণা বন্ধে অভিযান শুরু

কাতারে জনশক্তি আমদানিকারক দুই প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল

কাতার প্রতিনিধি ●

কাতারে জনশক্তি আমদানি ও রপ্তানির সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতারণা বন্ধে বড় ধরনের অভিযান শুরু করেছে সরকার। এ পর্যন্ত দুটি বৃহৎ জনশক্তি কোম্পানির লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিল করা হয়েছে।

কাতারের প্রশাসন, জনশক্তি ও সমাজকল্যাণবিষয়ক মন্ত্রণালয় এই অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছে। নিয়মিত তদারকি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও জনশক্তিসংক্রান্ত আইনের সফল প্রয়োগ নিশ্চিত করতে এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। আইন অনুসারে কর্মী নিয়োগদাতা একাধিকবার চুক্তির লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাতিলের অধিকার রাখে। সাধারণত কাতারে কর্মক্ষেত্রে যোগদানের আগে নিয়োগ পাওয়া কর্মী ও নিয়োগদাতার মধ্যে চুক্তি হয়ে থাকলেও অনেক সময় তা লঙ্ঘন করা হয়।

এর আগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, ২০০৫ সালে জারি করা অষ্টম অধ্যাদেশের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করায় দুটি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স চূড়ান্তভাবে বাতিল করা হয়েছে। এই অধ্যাদেশে বিদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের নীতিমালার বিবরণ দেওয়া আছে। কর্মী নিয়োগের নীতিমালা মেনে চলার জন্য ইতিপূর্বে ওই দুটি প্রতিষ্ঠানকে জনশক্তি মন্ত্রণালয় একাধিকবার সতর্ক করেছিল।

ওই দুটি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিলের বিষয়টি নিশ্চিত করে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ওই দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সব ধরনের লেনদেন সম্পন্ন করতে পাওনাদারদের তিন মাসের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে লাইসেন্স বাতিল করা দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ নিয়োগদাতাদের সব রকম নিয়োগ ও চুক্তিপত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসন, জনশক্তি ও সমাজকল্যাণবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মী নিয়োগ বিভাগ মাঝেমধ্যে বিভিন্ন জনশক্তি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালায়। মন্ত্রণালয়ের এই বিভাগ কাতারে দেশি-বিদেশি কর্মী নিয়োগের লাইসেন্স প্রদান, তাদের কার্যক্রম তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তিসংক্রান্ত কাজ করে থাকে।

কিছুদিন আগে জনশক্তি সম্পর্কিত কমিটির নিয়মিত এক বৈঠকে জনশক্তিসংক্রান্ত নীতিমালা সহজীকরণের জন্য ওই কমিটিতে জনশক্তি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। এ লক্ষ্যে জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশগুলোর সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানান প্রশাসনিক উন্নয়ন, জনশক্তি ও সমাজকল্যাণবিষয়ক মন্ত্রী ড. ঈসা বিন সাদ আলনুলাইমি।

সম্প্রতি কাতার চেম্বারের সঙ্গে মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সভায় মন্ত্রী বলেন, জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশগুলোর কাছ থেকে অনুমোদিত জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা চাওয়া হয়েছে।

কাতার চেম্বারের জনশক্তিবিষয়ক কমিটিও প্রবাসী কর্মীদের নিজ দেশ থেকেই নিয়োগের চুক্তিপত্র যাচাই করার সুযোগ সৃষ্টির ব্যাপারে মত দিয়েছে। এতে করে পরবর্তী সময়ে প্রতারণার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমবে বলে কমিটির সদস্যরা মতামত ব্যক্ত করেন।

গ্রা ফি তি

পরিত্যক্ত দেয়ালে তুলির হাসি

তামীম রায়হান, কাতার ●

দেয়ালে এভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শিল্পকর্ম ● প্রথম আলো

গ্রাফিতি নিয়ে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নেই। কাতারেও গ্রাফিতিশিল্প শিক্ষার কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। তাতে কী? নিজের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। প্রযুক্তির এই যুগে কেবল ইউটিউবে গ্রাফিতিশিল্পের নানা কৌশল রপ্ত করে বাসায় বসে বসে চর্চা করে গেছেন। তাতেই ধীরে ধীরে এই শিল্পে হাত পাকা হয়ে উঠেছে তাঁর। এখন কাতারে গ্রাফিতিশিল্পী হিসেবে তাঁর বেশ পরিচিতি। নানা এলাকায় পরিত্যক্ত দেয়াল আর বাড়ির গায়ে শোভা পাচ্ছে তাঁর চোখজুড়ানো শিল্পকর্ম। এই শিল্পীর নাম মুবারক আল মালিক। দেশের তরুণসমাজের কাছে এই শিল্পী মুবারক ১২২১ নামে পরিচিত। তাঁকে দেখে উৎসাহিত হয়ে এ দেশের অনেক তরুণ শিল্পী এখন গ্রাফিতিশিল্পে নাম লেখাচ্ছেন।

অবহেলার বালুঝড়ে ঢেকে থাকা কাতারের রাজধানী দোহার চারপাশের পরিত্যক্ত অনেক ভবন, উদ্যান আর বাড়ির সীমানাদেয়াল এখন আর খালি নেই। এসব পরিত্যক্ত দেয়ালে জমে থাকা ধুলোর আস্তরণ সরিয়ে জীবনের আঁচড় দিয়ে যাচ্ছেন নিভৃতচারী শিল্পী মুবারক আল মালিক। বিশাল কংক্রিটের দেয়ালের ক্যানভাসে আরবের পপ সংস্কৃতির চিত্রনাট্য আর কল্পনার মিশেলে ফুটিয়ে তুলছেন একের পর এক গ্রাফিতি। এক হাতে রঙের স্প্রে আর তুলি ধরা, অন্য হাতে এতটুকু ক্লান্তি নেই সদ্য ত্রিশে পা রাখা এই গ্রাফিতিশিল্পীর।

মুবারক আল মালিকের আঁকা বেশ কয়েকটি জমকালো ম্যুরালে মূর্ত হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী পোশাক বাতুলা পরিহিত লাজুক কাতারি নারীর প্রতিমূর্তি। রং-তুলিতে স্বপ্ন দেখা এই শিল্পীর ক্যানভাস আরও বিস্তৃত হবে অনাগত দিনে। দোহা মেট্রোর ঝকঝকে বগিগুলো হয়ে উঠবে মুবারক আল মালিকের গ্রাফিতি ক্যানভাস। তাঁর চিত্রকর্মে সজ্জিত দোহা মেট্রোরেল ২০১৯ সাল নাগাদ দাপিয়ে বেড়াবে দোহাসহ কাতারের বিভিন্ন অঞ্চল।

কাতারের তরুণসমাজের কাছে এই শিল্পী মুবারক ১২২১ নামে পরিচিত। শুধুই ইউটিউবের ভিডিও দেখে দেখে হাত পাকানো এই শিল্পী আলোচনায় উঠে আসেন বছর পাঁচেক আগে। তাঁর শিল্পকর্মে জনপ্রিয় গ্রাফিতিশিল্পী বাল্সকির শিল্পকর্মের ছাপ রয়েছে।

দোহা নিউজ-এর সঙ্গে আলাপকালে মুবারক বলেন, 'বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দেয়ালে দেয়ালে ফুটে থাকা গ্রাফিতিগুলো বৈচিত্র্যময় বিশ্ব সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। কখনো ঐতিহ্য, কখনো প্রতিবাদ; এমনকি কখনো কখনো সমাজের ঘুণে ধরা প্রথার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গকণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয় নির্বাক দেয়ালের বিশাল ক্যানভাসে। বছর কয়েক আগে আমি নিজের কাছে প্রশ্ন করি, কেন কাতারের দেয়ালগুলো এখনো ধূসর রয়ে গেল? তখন থেকেই আমি কাতারের শিল্পচর্চায় গ্রাফিতি সংযোজনের পরিকল্পনা করি।'

তবে গ্রাফিতিচর্চার প্রথম দিকে বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন মুবারক। কাতারে এ ধরনের কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকায় প্রথম দিকে কয়েক মাস তিনি নিজে নিজে ঘরেই হাতে-কলমে চেষ্টা করতে থাকেন। এরপর বেরিয়ে পড়েন দোহা নগরীর রাস্তায়।

সালোয়া সড়কের ধারে নিশান গাড়ির শোরুমের কাছে নির্জন পরিত্যক্ত একটি দেয়ালে রয়েছে শিল্পী মুবারকের বিখ্যাত কয়েকটি সৃষ্টিকর্ম। সেখানকার পরিত্যক্ত দেয়ালে রঙের স্প্রেতে লিখেছেন জনপ্রিয় আরবি প্রবাদ। এঁকেছেন বিখ্যাত আরব ব্যক্তিত্ব ও কিংবদন্তি মিসরীয় পপ গায়িকা উম্মে কুলসুমের অবয়ব। এক পাশে তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন হাস্যোজ্জ্বল কাতারের সাবেক আমির হামাদ বিন খলিফা আলথানির অবয়ব।

স্বীকৃতিস্বরূপ এরই মধ্যে পেয়েছেন নানা সম্মাননা। কুড়িয়েছেন সমালোচকদের প্রশংসা। ইতিমধ্যে কাতারা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও অসংখ্য শিল্প প্রদর্শনী কেন্দ্রে মুবারকের শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে। অনেক দেশে এখনো গ্রাফিতিকে দেখা হয় অপরাধ হিসেবে। কোথাও কোথাও এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তবে মুবারক জানালেন, গ্রাফিতির ক্ষেত্রে নিজে খুব সতর্ক থাকেন। বিনা অনুমতিতে কোনো দেয়ালে গ্রাফিতি করা একধরনের অনধিকার চর্চা। এর জন্য শাস্তি পাওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

বিষয়টি মাথায় রেখে মুবারক গ্রাফিতির ক্যানভাস হিসেবে কাতারের পরিত্যক্ত এলাকার ব্যবহারের অনুপযোগী দেয়াল বেছে নিয়েছেন। প্রতিটি গ্রাফিতির শেষে নিজের স্বাক্ষর রেখে আসেন বলে দাবি করেন এই শিল্পী। এমনকি এ জন্য যেকোনো ক্ষতির দায়দায়িত্ব বহন করতেও তিনি রাজি। তবে এখনো তিনি শুভাকাঙ্ক্ষীদের বিপুল সাড়া পাচ্ছেন।

কাতারের গ্রাফিতিশিল্পের বিকাশে প্রধান প্রতিকূলতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুবারক বলেন, গ্রাফিতির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কাতারে এখনো দুর্লভ এবং ব্যয়বহুল। বর্তমানে এক বোতল স্প্রে ক্যানের মূল্য ৫০ রিয়াল। গ্রাফিতির জন্য বিশেষভাবে নির্মিত অ্যারোসল স্প্রেতে অ্যালকোহলের পরিমাণ অত্যধিক হওয়ায় কাতারের বাজারে এগুলো বিক্রি হয় খুবই কম।

মুবারকের দেখাদেখি এখন কাতারে আরও অনেক শিল্পী গ্রাফিতি শিল্পকর্মে এগিয়ে আসছেন। সুন্দর সুন্দর মুখের অবয়বে দর্শনীয় হয়ে উঠছে কাতারের পরিত্যক্ত অনেক দেয়াল। নানা প্রতিকূলতার পরও কাতারের গ্রাফিতিশিল্পীরা আরও অনেক দেয়ালে ছড়িয়ে দিতে চান এই শিল্পকর্মকে।

শিল্পী মুবারক বলেন, 'একটা সময় কাতারে আমিই একমাত্র গ্রাফিতিশিল্পী ছিলাম। এখন আরও অনেক শিল্পী এই মাধ্যমের প্রতি উৎসাহ দেখাচ্ছেন।' ভবিষ্যতে এই শিল্পের গণ্ডি কাতারে আরও অনেক বিস্তৃত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সুই-সুতায় সাফল্যের নকশা

রহিদুল মিয়া, তারাগঞ্জ (রংপুর) ●

বাঙালি গৃহবধূ বলতে আমাদের চোখের সামনে নারীর যে চেহারা ফুটে ওঠে, তা থেকে তিনি আলাদা। তিনি সংগ্রামী, পরোপকারী এবং পরিশ্রমী। পরিশ্রম করে শুধু নিজের ভাগ্যবদলই করেননি, গ্রামের অনেক নারীকে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখিয়েছেন। তাঁর সহায়তায় সুই-সুতা দিয়ে কাপড়ে নকশা তুলে রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার অন্তত তিন শ নারী দাঁড়িয়েছেন নিজের পায়ে। এই গৃহবধূর নাম শিল্পী বেগম। সবার কাছে তিনি প্রিয় শিল্পী আপা। কুটিরশিল্পের ১৬ ধরনের কাজে পটু তিনি। প্রায় দিনই ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে পড়েন। কাজ নিয়ে মোটরসাইকেলে ছুটে চলেন তারাগঞ্জে বিভিন্ন গ্রামে। কাজ বুঝিয়ে দিয়ে ফেরেন বাড়িতে। দরিদ্র নারীদের দুঃখ ঘোচাতে এ তাঁর অন্য রকম আন্দোলন।

শিল্পীর বাড়ি রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার জিগারতলা গ্রামে। দশম শ্রেণিতে উঠে ১৯৯৬ সালে ১৫ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় পলাশের নাটুয়াপাড়া গ্রামের আবদুল হান্নানের সঙ্গে। স্বামী ছিলেন বেকার। অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী। প্রায়ই অনাহারে-অর্ধাহারে থাকতে হতো। কিন্তু শিল্পীর স্বপ্ন ছিল পরিবারের অবস্থা ফেরানোর। ১৯৯৭ সালে এসএসসি পাস করে চাকরি খোঁজা শুরু করেন। ডিগ্রি পাস স্বামীর ব্র্যাকে একটা চাকরি জুটলেও বেকারই থাকতে হলো শিল্পীকে।

শুরুর কথা

বাবার বাড়িতে মায়ের কাছে শিল্পী শিখেছিলেন সুই-সুতার কাজ। সেটা কাজে লাগানোর জন্য একটা সেলাই মেশিন কিনলেন। নিজ বাড়িতে শুরু করেন কাপড় সেলাইয়ের কাজ। এতে কিছু আয় হয়। দুই বছরের আয়ের টাকায় কেনেন একটি গাভি ও চারটি ছাগল। তাঁর নতুন জীবনের গল্প এখান থেকেই শুরু।

২০০৪ সালের জুন মাসের কথা। শিল্পী মেনানগর গ্রামে ননদ রাজিয়া খাতুনের বাড়িতে বেড়াতে যান। সেখানে মইনুল হক নামের এক ব্যক্তির অধীনে কয়েকজন নারীকে শাড়িতে নকশা তোলার কাজ করতে দেখেন। কাজটি তাঁর মনে ধরে। কাজটি শিখতে তিনি আগ্রহী হন। কিছুদিন পর ননদের বাড়িতে দিন দশেক থেকে মইনুলের কাছে শিখে নেন সেই কাজ। সেটা কাজে লাগিয়ে মেয়েদের পোশাক তৈরির জন্য একটি দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নেন। ভাবলেন, এখানে তৈরি করা পোশাক হবে আলাদা, যাতে থাকবে সুই-সুতার কাজ।

এই ভাবনা থেকেই ২০০৫ সালে ৬০০ টাকা দিয়ে একটি কাঠের ফ্রেম কেনেন। নিজ বাড়িতে শুরু করেন সেলাই ও হাতের কাজ। ধীরে ধীরে এই পোশাকের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। আয় ও ব্যবসার পরিধি বেড়ে যাওয়ায় তারাগঞ্জ বাজারে পোশাক বিক্রির জন্য একটি দোকান করেন। পসার বেড়ে যাওয়ায় ২০০৭ সালে স্বামী চাকরি ছেড়ে তাঁকে সহায়তা করতে থাকেন।

এগিয়ে চলা

শাড়িতে নকশা তোলার গল্প শুনে ২০০৯ সালে শিল্পীর বাড়িতে আসেন ঢাকার কাপড় ব্যবসায়ী এজাজ উদ্দিন। এজাজের ঢাকায় কয়েকটি কাপড়ের শোরুম রয়েছে। তিনি শিল্পীকে ঢাকায় নিয়ে যান। স্থানীয় এজেন্ট মনোনীত করে তাঁর হাতে তুলে দেন শাড়ি, পাঞ্জাবি ও থ্রি পিসে নকশা করার সরঞ্জাম। এজেন্ট হওয়ার পর শিল্পীর কাছে শাড়ি ও পাঞ্জাবি তৈরির কাপড়, সুতা ও উপকরণ আসতে থাকে। তখন এ কাজের সঙ্গে গ্রামের দরিদ্র ও অভাবী পরিবারের নারীদের যুক্ত করার চিন্তা করেন শিল্পী।

২০১০ সালে গ্রামের ৫০ জন দরিদ্র নারীকে নিয়ে গঠন করেন 'হতদরিদ্র কর্মজীবী মহিলা উন্নয়ন সমিতি'। তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নকশা ও কারচুপির কাজে লাগিয়ে দেন। প্রথমে ৫০ জনের মতো নারী এই কাজ শুরু করলেও বর্তমানে সদস্য ২৮০ জন। কারিগরেরা লেহেঙ্গায় নকশা করার জন্য ৫০০ টাকা, শাড়িতে ৭০০ টাকা, পাঞ্জাবি ও থ্রি পিসে ৪০০ টাকা করে মজুরি পান। শাড়ি, থ্রি পিস, পাঞ্জাবিতে নকশার কাজ করিয়ে দেওয়ার জন্য শিল্পী ৯০ টাকা করে কমিশন পান। এই আয়ের টাকায় আবাদি জমি ও পাকা বাড়ি করেছেন। কিনেছেন মোটরসাইকেল। তারাগঞ্জ বাজারে কাপড়ের দোকান তো রয়েছেই। তাঁর এক মেয়ে নুসরাত নাহার রংপুর কারমাইকেল কলেজে, আরেক মেয়ে নওশীন নাহার তারাগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে।

সেই গ্রামে একদিন

সম্প্রতি এক সকালে জিগারতলা গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, গ্রামটির নারীরা পাঞ্জাবি, লেহেঙ্গা, শাড়িতে নকশা তোলার কাজ করছেন। একটি সাধারণ কাপড়ে নকশার কাজের পর কতটা অসাধারণ হয়ে ওঠে, তা না দেখে বিশ্বাস করা কঠিন। সেখানকার বেশির ভাগ বাড়িতে চকচক করছে টিনের চালা। খড়ের ঘর নেই বললেই চলে। গ্রামের নারীরা শাড়িতে সুই দিয়ে চুমকি, জরি, পুঁতি বসানোর কাজে ব্যস্ত।

মাহামুদা আক্তার (৪০) নামের এক কারিগর জানান, এখন ঢাকার ব্যবসায়ী ছাড়াও বিভিন্ন জেলা-উপজেলার পাইকারেরা অর্ডার দিয়ে শাড়িতে নকশার কাজ করে নেন। তাঁরাই এখন শাড়িতে কাজ করতে প্রয়োজনীয় সুই-সুতা, চুমকি, জরি ও পাথর দেন। প্রতিটি শাড়ির মজুরি বাবদ কারিগরদের দেওয়া হয় ৬০০-৭০০ টাকা। একজন নারী কারিগর মাসে ছয়-সাতটি শাড়িতে নকশার কাজ করতে পারেন।

সামাজিক কর্মকাণ্ড

সমিতিতে গিয়ে দেখা যায়, শিল্পী বেগম সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করছেন। তিনি *প্রথম আলো*কে জানালেন, সমিতির সদস্য ছাড়াও বাইরের নারীরা শাড়িতে নকশার কাজ করেন। তাঁরা সপ্তাহে সমিতিতে ২০ টাকা করে সঞ্চয় দেন। সদস্যদের এ সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে গরু কিনে মোটাতাজা করার জন্য সদস্যদের মধ্যে বর্গা দেওয়া হয়েছে। এ খাত থেকে আসা আয়ের ১৫ শতাংশ অর্থ গ্রামবাসীর কল্যাণে ব্যয় করা হয়।

মর্জিনা বেগম নামের এক সদস্য বলেন, এ পর্যন্ত গরিব ঘরের ১৪টি মেয়ের বিয়েতে সহযোগিতা করা হয়েছে, চিকিৎসার জন্য ১১ জনকে টাকা দেওয়া হয়েছে। ৪ জন নারীর সন্তান প্রসবের সময়ও সহায়তা করা হয়েছে।

সমিতির আরেক সদস্য রশিদা খাতুন বলেন, এ সমিতির সদস্যরা সবাই সমান পরিশ্রম করেন। সবাইকে কাজও ভাগ করে দেওয়া আছে। সমিতির ১৬ জন নারী নিয়ে এক একটি দল গঠন করা আছে। এ দলের সদস্যরা মাসে একবার ঘরে ঘরে গিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নারীদের ধারণা দেন। শিশুদের সময়মতো টিকা দেওয়া হয়েছে কি না খোঁজ নেন।

তাঁরা যা বললেন

তারাগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মাহামুদা বেগম বলেন, কী করে ছোট্ট একটি সুই-সুতার কাজ বিশাল কর্মযজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে, তা শিল্পীর কাছে শিখতে হবে। শিল্পীর হাত ধরে গ্রামের নারীরা বাঁচার পথ খুঁজে পাচ্ছেন। অন্য এলাকার নারীরাও তাঁদের দেখে অনুপ্রেরণা পাবেন।

উপজেলার ইউএনও জিলুফা সুলতানা বলেন, 'শিল্পীর কর্মকাণ্ড দেখে আমরা একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছি। ওই প্রকল্পের অধীনে উপজেলা পরিষদের অফিসার্স ক্লাবের হলরুমে শিল্পী বেগম বিনা পারিশ্রমিকে হতদরিদ্র নারীদের শাড়ি, পাঞ্জাবি ও থ্রি পিসে নকশা করার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।'

শিল্পীর উদ্যোগের প্রতি সম্মান আছে স্বামী হান্নানের। বললেন, 'শিল্পীর কর্মকাণ্ডে আমি খুশি। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে সব সময় উৎসাহ দিয়ে থাকি। লোকজন যখন শিল্পীর প্রশংসা করে, স্বামী হিসেবে আমার গর্ব হয়।'

তারাগঞ্জের জিগারতলা গ্রামে 'হতদরিদ্র কর্মজীবী মহিলা উন্নয়ন সমিতির' সদস্যদের সঙ্গে শাড়িতে নকশা তোলার কাজ করছেন শিল্পী বেগম ● প্রথম আলো

শিল্পী বেগমের দোকানে তাঁদের নকশা করা শাড়ি দেখছেন এক ক্রেতা ● প্রথম আলো

বাহরাইনে প্রবাসী শ্রমিকদের অবৈধ আবাসন বাড়ছে

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে প্রবাসী শ্রমিকদের অবৈধ আবাসন বাড়ছে। জরাজীর্ণ ভবনের এই আবাসনগুলোতে স্থান নেওয়া বেশির ভাগই অবৈধ প্রবাসী কর্মী। ফলে তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাঝুঁকিও বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

বাহরাইনের শ্রম ও সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্যমতে, দেশটিতে সর্বমোট ৩ হাজার ১৪৭টি বৈধ ও নিবন্ধিত আবাসন রয়েছে। কিন্তু এসব আবাসনের পাশাপাশি এখন অবৈধ আবাসনের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

লেবার আন্ডার সেক্রেটারি সাবা আল দোসারি বলেন, কোনো কোনো অবৈধ শ্রমিক আবাসন পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। পরিদর্শক দল সেগুলোতে প্রবেশ করতে পারে না। এর কারণ হলো সেগুলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে নিবন্ধিত। তিনি বলেন, একটি প্রধান সমস্যা হলো জরাজীর্ণ ভবনগুলো অবৈধ প্রবাসী শ্রমিকদের কাছে ভাড়া দিচ্ছেন এর মালিকেরা। সেখানে তাঁরা ঝুঁকি নিয়ে বাস করেন। এসব ভবন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে নিবন্ধিত বলে ভেতরে যেতে পারেন না পরিদর্শক দলের সদস্যরা। একসময় এসব জরাজীর্ণ ভবনে বাস করতেন বাহরাইনের নাগরিকেরা। তাঁরা অন্যত্র চলে যাওয়ার পর এসব ভবন ভাড়া দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভবনগুলো এখনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবেই নিবন্ধন রয়েছে।

> কোনো কোনো ভবন এতই জরাজীর্ণ যে, যেকোনো সময় তা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। দ্বিতীয় প্রধান যে সমস্যা দেখা যায় তা হলো, ভবনগুলোতে অগ্নিনির্বাপণের কোনো ব্যবস্থা নেই

সাবা আল দোসারি জানান, এসব ভবনে কোনো রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয় না, ছোট একটি কক্ষে বেশ কয়েকজন শ্রমিক বাস করেন। একজন ভবনের মালিক যখন কোনো ভবন ভাড়া দেন, তখন তাঁর উচিত বিষয়টি মন্ত্রণালয়কে জানানো। এটা হলে আমরা সেটা আমাদের তথ্যভান্ডারে যুক্ত করতে পারি।

সাবা আল দোসারি জানান, পরিদর্শকেরা বিভিন্ন নিবন্ধিত শ্রমিক শিবির পরিদর্শন করে ৩৬ ধরনের অনিয়মের অভিযোগ পেয়েছেন। এসব ঘটনায় কোনো ক্ষেত্রে বাড়ির মালিকদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, কোনো ক্ষেত্রে বিষয়টি পাবলিক প্রসিকিউশনে জানানো হয়েছে। সবচেয়ে বড় যে সমস্যা পাওয়া গেছে সেটা হলে, রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। কোনো কোনো ভবন এতই জরাজীর্ণ যে যেকোনো সময় তা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। দ্বিতীয় প্রধান যে সমস্যা দেখা যায় তা হলো, ভবনগুলোতে অগ্নিনির্বাপণের কোনো ব্যবস্থা নেই। কোনো কোনো ভবনে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাও ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রবাসী কর্মীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স প্রটেকশন সোসাইটি (এমডব্লিউপিএস) অভিযোগ করেছে, জরাজীর্ণ ভবনে অবৈধভাবে শ্রমিক আবাসন করে বাহরাইনের ওই ভবনমালিকেরা মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলছেন। এমডব্লিউপিএসের চেয়ারম্যান ম্যারিত্তা ডায়াস বলেন, আমরা বারবার বলছি অবৈধ শ্রমিক শিবিরগুলো মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়িয়েই চলছে। গত কয়েক মাসে তিনটি শ্রমিক শিবিরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সবারই এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া উচিত।

সূত্র: গালফ ডেইলি নিউজ

প্রথম আলো
সাপ্তাহিক উপসম্পাদকীয় সংস্করণ
Prothom Alo Weekly
Now available at
Grand Mall
HYPERMARKET
Grand Mall, West End Park, Near Karwa
Head Office,P.O. Box: 40465, Doha Qatar